



মাসিক
আলোকধাৰা

তাসাওউফ বিষয়ে বহুখী গবেষণা ও বিশ্লেষণমূলক জার্নাল

রেজিঃ নং চ-২৭২
২৭তম বৰ্ষ
৭ম সংখ্যা
জুনাই ২০২১ ঈসায়ী



আওলাদে রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লাম, গাউসুল আযম বিল বিরাসত হ্যরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ গোলাম রহমান (ক.)'র মহান '২২ চৈত্র উরস শরিফ উপলক্ষে বাংলাদেশে প্রবর্তিত একমাত্র তৃরিকা, বিশ্বসমাদ্দত তৃরিকা-ই মাইজভাণ্ডারীয়া'র প্রবর্তক গাউসুল আযম হ্যরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র প্র-প্রপৌত্র, আওলাদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, 'দরবার-ই-গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী'র 'গাউসিয়া হক মনজিল-এর সম্মানিত সাজাদানশীন শাহখ হ্যরত আল্লামা শাহ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মং) যথাক্রমে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী, গাউসুল আযম বিল বিরাসত শাহ সুফি সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাণ্ডারী, অসিয়ে গাউসুল আযম শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী এবং বিশ্বালি শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী'র পবিত্র রওজা যিয়ারত, গিলাফ চড়ানো এবং মিলাদ মাহফিল শেষে মুনাজাত করেন



'এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট' এর কর্মকর্তাদের সাথে 'মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রিয় পর্ষদ' নিয়ন্ত্রণাধীন দেশের বিভিন্ন জেলার শাখা কমিটিসমূহের নেতৃত্বন্দের সাথে সাংগঠনিক মতবিনিময় সভার কয়েকটি চিত্র

আলোকধারা

THE ALOKDHARA
A MONTHLY JOURNAL OF
TASAWWUF STUDIES

রেজি. নং চ ২৭২, ২৭তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা

জুলাই ২০২১ ইসায়ী

জিলকুন্দ-জিলহজ ১৪৪২ হিজরী

আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪২৮ বাংলা

প্রকাশক

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর পবিত্র রক্ত ও
তৃরিকতের উত্তরাধিকার সূত্রে এবং অছিয়ে গাউসুল
আযম মাইজভাণ্ডারী প্রদত্ত দলিলমূলে, গাউসুল
আযম মাইজভাণ্ডারীর রওজা শরিফের খেদমতের
হকদার, তাঁর স্মৃতি বিজড়িত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের
হকদার, শাহী ময়দান ব্যবস্থাপনার হকদার-
মাইজভাণ্ডার শরিফ গাউসিয়া হক মন্জিলের
সাজাদানশীল

সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান

সম্পাদক

ড. সৈয়দ আবদুল ওয়াজেদ

যোগাযোগ:

০১৭৫১ ৭৪০১০৬

০১৩১০ ৭৯৩৩৩২

মূল্য : ২০ টাকা \$=2

সম্পাদকীয় যোগাযোগ:

দি আলোকধারা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
সৈয়দ সলিমুল্লাহ শাহ্ রোড, বিবিরহাট
পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম-৮২১১। ফোন: ০২৩৩৪৪৫৪৩২৬-৭



এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট-এর পক্ষে
মাইজভাণ্ডারী একাডেমি প্রকাশনা

www.sufimaizbhandari.org.bd

E-mail:sufialokdhara@gmail.com

সূচী

□ সম্পাদকীয়	২
□ ফিলিস্তিনি জনগণের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা কামনা	
- সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী	৩
□ বেলায়তে মোত্তাকা (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)	
খাদেমুল ফোকারা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)	
বেলায়তের দুই যুগের বিকাশ : বেলায়তে মোকাইয়্যাদা এবং	
বেলায়তে মোত্তাকা	৮
□ বিশ্ব নবী হ্যরত মুহাম্মদ (দ.) এর তাসাওউফ ধারা	
অধ্যাপক জগত্তর উল আলম	৮
□ উম্মুল মু'মিনীন হ্যরত উম্মে সালমা বিনতে আবু উমাইয়া (রা.)	
মো. গোলাম রসুল	১৫
□ তাওহীদের সূর্য : মাইজভাণ্ডার শরিফ এবং বেলায়তে	
মোত্তাকার উৎস সন্ধানে	
জাবেদ বিন আলম	১৮
□ আয়নায়ে বারী কিতাবের ভাবার্থ	
এস এম এম সেলিম উল্লাহ	২৫
□ প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি এবং সুফিবাদ	
হাসনাত রেজা	৩২
□ ফতুহাতে মুক্তি	
অনুবাদ : আবরার ইবনে সেলিম ইবনে আলী	৩৬
□ নারী জাতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম	
আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইকবাল	৪০
□ সালামের মাধ্যমে অভিবাদন জ্ঞাপনই মুসলিম উম্মাহ'র ঐতিহ্য	
মোহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন	৪৩
□ সুফি সাধকের জীবন প্রবাহের মূলনীতি	
মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম	৪৫

সম্পাদকীয়

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহতায়ালার। বাংলাদেশ তথা সমগ্র বিশ্বব্যাপী বিশ্ব মানবতা আজ যখন করোনা মহামারির ছেবলে সন্ত্রস্ত এবং তারই মধ্যে ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থের অমানবিকতায় ফিলিস্তিনসহ পৃথিবীর নানাপ্রাণ্তে যখন অগণিত শান্তিপ্রিয় মুসলিম নর-নারি-শিশু যুদ্ধ-হামলার কঠিন অভিঘাতে বিপন্ন, তাদের মুক্তি ও শান্তির জন্য আজ আকুল ফরিয়াদ পেশ করা হয়েছে মহান আল্লাহ রাবুল আলামিনের শাহী দরবারে।

মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ দরবারে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর গাউসিয়া হক মন্ডিলের সাজাদানশীন, শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্টের ম্যানেজিং ট্রাস্টি, রাহবারে আলম হ্যরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.) বাংলাদেশ তথা সারা বিশ্বকে করোনা মহামারি থেকে মুক্তি এবং একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ফিলিস্তিনের অস্তিত্ব ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য মহান রাবুল আলামিনের দরবারে আকুল ফরিয়াদ জানিয়েছেন। বিশ্বের বুকে বেলায়তে মোত্লাকার কেন্দ্রভূমি, মহান আল্লাহর রহমত, বরকত ও রহানি ফয়েজের আলোকিত পবিত্র স্থান, অগণিত বিপন্ন মানবতার আত্মার পরমপ্রিয় আশ্রয়স্থল, বিশ্বালি শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) পবিত্র রওজা শরিফ থেকে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় আওলাদে রসূল রাহবারে আলম মওলা হুজুর এই ফরিয়াদ জানান এবছর অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া পবিত্র ঈদ উল ফিতরের দিন বাদ জুমআ'র বরকতময় মুহূর্তে। এবারের মাসিক আলোকধারা'র শুরুতেই এই মুনাজাতের বার্তা বিপন্ন মানবতার নাজাতের উসিলা হিসাবে পত্রস্থ হলো। আমিন।

'মাইজভাণ্ডারীয়া তৃরিকা'র স্বরূপ উন্নোচনে লিখিত রূপ বেলায়তে মোতলাকা গ্রন্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হচ্ছে এর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। 'আলোকধারা'র এই সংখ্যায় এই পরিচ্ছেদের সম্পূর্ণটি মুদ্রিত হলো। মাইজভাণ্ডারীয়া তৃরিকার প্রাণপুরূষ, খাতামুল অলদ হ্যরত গাউসুল আযম মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.) যে একজন যুগ-সংস্কারকও তা এই গ্রন্থে যথাযথ যুক্তি সহকারে উপস্থাপিত হয়েছে। অছিয়ে গাউসুল আযম, সুলতানুল আউলিয়া, খাদেমুল ফোকারা, মাইজভাণ্ডারীয়া তৃরিকার রহানি ভাষ্যকার হ্যরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁর পবিত্র কলমে এই পরিচ্ছেদে নবী ও অলিআল্লাহগণের দ্বারা যুগসংস্কারে মহান আল্লাহতায়ালার মহান অভিপ্রায়ের গতিধারা তুলে ধরতে গিয়ে বেলায়তে মোকাইয়্যাদা এবং বেলায়তে মোত্লাকা যুগের গভীর বিশ্লেষণ ঐতিহাসিক আলোকে বিশদ করেছেন। এই যুগ-সংস্কার প্রকৃতপক্ষেই খোদা-পরিচিতির পথ সুগম করার জন্য যে অনুসৃত হয়েছে তা তিনি দ্যুর্থহীন যুক্তির আলোকে উপস্থাপন করেছেন। এই অধ্যায়ে আমরা পবিত্র কোরআন, মাওলানা রহমির (র.) মসনবি শরিফ, পবিত্র কালিমা ঈমান-ই-মুজমাল এবং ঈমান-ই-মুফাস্সাল, আয়না-ই-বারি, ফসুল হেকম, সৌদি আরবের বাদশাহ ফয়সলসহ ভূতপূর্ব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রাসঙ্গিক বাণী, বক্তব্য ও মন্তব্যের ব্যাপক উদ্ধৃতি ও বিশ্লেষণ পাই। যা সত্যিই তাৎপর্যপূর্ণ। মূলতঃ এই অধ্যায়টিও অছিয়ে গাউসুল আযম (ক.)-এর বাংলা ভাষার সাধুরীতির লিখিত রূপে রূপান্তরিত হয়েছে মূল ভাষ্যকে অবিকৃত অপরিবর্তিত রেখে। ফলে এটিকে বলা যায় সারানুবাদ ও ভাষা রূপান্তরে সম্পাদনাকৃত। পৃথিবীর সকল পবিত্র গ্রন্থেই বিভিন্ন ভাষা ও বাক্রীতির সংক্রণ রয়েছে।

এই সংখ্যায় ধারাবাহিক রচনা 'বিশ্বনবী হ্যরত মুহাম্মদ (দ.) এর

তাসাওউফ ধারা' শীর্ষক ধারাবাহিক রচনায় বিশিষ্ট লেখক অধ্যাপক জহুর উল আলম তাঁর মরমি ভাষায় 'তাসাওউফ ধারায় হ্যরত পরবর্তী মদীনা সাধারণতন্ত্র ব্যবস্থা এবং জিহাদের প্রভাব' উপ-শিরোনামে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়া তরিকতের মহান খোদাপ্রেমিক অলিআল্লাহ বুজুর্গবৃন্দের কঠিন সংগ্রামের সত্যিকার ঘটনাবলি তুলে ধরেছেন। প্রসঙ্গত: এখানে ব্যক্ত হয়েছে-ইসলামের শান্তি-সাম্য-পবিত্রতা ও সহমর্মিতা এবং আল্লাহর পছন্দীয় রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা নবী (দ.) প্রবর্তিত ঐতিহাসিক 'মদীনা সনদ' এর কথা। এখানে মতপথ নির্বিশেষে সব মানুষের যেমন আত্মার অফুরন্ত নৈতিক স্বাধিকার রয়েছে, তেমনি রয়েছে বিশ্বাস ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতার মধ্য দিয়ে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের জন্য কঠোর শান্তির উদাহরণ। খিলাফত থেকে মুসলিম সমাজের বিচ্ছুতি, ইসলামের শান্তি ও পবিত্র জীবনধারায় মানবতাকে সিঙ্গ করতে রসূল (দ.)-এর অত্যন্ত প্রিয়ভাজন আসহাবে সুফ্ফাদের অনাড়ম্বর খোদামগ্ন জীবন, সিফ্ফিনের যুদ্ধে মুনাফেকদের কৃটিল কৌশল, হ্যরত ওয়ায়েস করণী'র (রহ.) কাছে বিশ্বনবী হ্যরত মুহাম্মদ (দ.) এর নির্দেশ অনুযায়ী মহানবী (দ.) প্রদত্ত খিরকা মুবারক সোপর্দ করার লক্ষ্যে দ্বিতীয় খলিফা হ্যরত উমর ফারুক (রা.) এবং বেলায়তের সম্মাট হ্যরত আলী (রা.) এর ইয়েমেন দেশের করণ এলাকায় গমন, তাদের মূল্যবান কথোপকথন এই রচনার মূল ভাববিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। সেই সাথে ভারত উপমহাদেশ ও বাংলায় আগত অলিআল্লাহ বুজুর্গগণ এবং সনাতন ইসলামের শান্ত সৌরভ ছড়াতে তাঁদের ত্যাগ-তিতীক্ষা, কারামত, ও মুখনিঃস্ত উপদেশাবলির অনুপম উপস্থাপন আছে এতে।

এই সংখ্যায় অগণিত মুমিনগণের পবিত্র মাতা, বিশ্বনবী হ্যরত মুহাম্মদ (দ.) এর ষষ্ঠ পবিত্র সহধর্মিনী হ্যরত উম্মে সালমা বিনতে আরু উমাইয়া (রা.) এর পবিত্র জীবনালেখ্য লিখেছেন বিশিষ্ট লেখক মো. গোলাম রসূল। উমুল মু'মিনিন হ্যরত উম্মে সালমা (রা.) এর অবিচল ঈমান, জীবন সংগ্রাম, দৃঢ় ব্যক্তিত্ব এই লেখায় বিধৃত। এছাড়া পবিত্র কোরআনের 'আয়াতে তাতহির' অবতীর্ণ হওয়ার আলোকে রসূল করিম (দ.) এর উদ্দ্যোগে তাঁর পবিত্র কম্বল আবৃত করে 'আহলে বাইত' তথা পাক পাঞ্জাতনের ঐতিহাসিক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীও এই পবিত্র মাতা। এই লেখাটিতে এসব ঘটনার প্রাঞ্জল বর্ণনা পাঠকের অন্তর্চক্ষে উন্নোচন করে সাড়ে চৌদশ' বছর আগের দূরত্ব ঘোচাবে নিঃসন্দেহে। মনে হবে তারাও যেনো এই পবিত্র ঘটনাটি অবলোকন করছেন।

এছাড়াও আলোকধারা'র এই সংখ্যায় জাবেদ বিন আলম রচিত ধারাবাহিক 'তাওহীদের সূর্য': মাইজভাণ্ডার শরিফ এবং বেলায়তে মোত্লাকার উৎস সন্ধানে', মাওলানা এস এম এম সেলিম উল্লাহ অনুদিত সৈয়দ আবদুল গণি কাঝুনপুরী রচিত গ্রন্থ 'আয়নায়ে বারী'র তৃতীয় কিন্তি, হাসনাত রেজা রচিত প্রবন্ধ 'প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি এবং সুফিবাদ', শায়খুল আকবর হ্যরত মুহিউদ্দীন ইবনে আরবি (রহ.) রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'ফতুহাতে মক্কিয়া'র আবরার ইবনে সেলিম ইবনে আলী'র করা বাংলায় অনুবাদ, আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইকবাল রচিত ধারাবাহিক রচনা 'নারী জাতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম', মোহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন এর গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ 'সালামের মাধ্যমে অভিবাদন জ্ঞাপনই মুসলিম উল্লাহ'র ঐতিহ্য', মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম রচিত প্রবন্ধ 'সুফি সাধকের জীবন প্রবাহের মূলনীতি' এবারের সংখ্যায় আলোকধারা'র অগণিত পাঠকের জন্য অসংখ্যমাত্রিক জ্ঞানের সওগাত উপস্থাপন করবে বলে আশা করি।

শাহখ হ্যরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাওরী (ম.)'র মুনাজাতে ফিলিস্তিনি জনগণের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা কামনা

মাইজভাওর দরবার শরিফ ‘দরবারে গাউসুল আযম মাইজভাওরী’র গাউসিয়া হক মনজিলের সাজ্জাদানশীল ও শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাওরী (কঃ) ট্রাস্টের ম্যানেজিং ট্রাস্টি, রাহবারে আলম শাহখ হ্যরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাওরী (ম.) বাংলাদেশ তথা সারা বিশ্বকে করোনা মহামারী থেকে মুক্তি এবং একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ফিলিস্তিনের অস্তিত্ব ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য মহান রাবুল আলামিনের দরবারে আকুল ফরিয়াদ জানিয়েছেন।

গত ১৪ মে পবিত্র ঈদ উল ফিতর এর দিন বাদ জুমআ বিশ্বালি শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাওরীর (ক.) রওজায় সরকার নির্ধারিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে

পরিচালিত মুনাজাত অনুষ্ঠানে তিনি এই ফরিয়াদ পেশ করেন। ফিলিস্তিনের অসহায় মজলুম সাধারণ জনগণের নিরাপত্তা ও মুক্তি বর্তমান ইতিহাসের অন্যতম প্রধান চাহিদা বলে উল্লেখ করে পরাশক্তিবর্গের মদদপুষ্ট ইসরাইলের সাথে স্বাধীন সার্বভৌম ফিলিস্তিনের অবস্থান নিশ্চিত করার জন্য মুসলিম উম্মাহকে বস্ত্রনিষ্ঠ কার্যকর পদক্ষেপ নেবার আহ্বান জানান। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অন্যায়ভাবে নির্যাতিত লাঞ্ছিত মানুষের মুক্তি, গৃহহীন, বস্ত্রহীন, অসুস্থ ব্যক্তিদের রোগ মুক্তির জন্য আল্লাহর রহমত কামনা করেন এবং অভাব, অশান্তি, যুদ্ধমুক্ত একটি পৃথিবীতে মানুষ যাতে মানুষের মতো বাঁচতে পারে সেই পরিবেশ কামনা করেন।

বেলায়তে মোত্লাকা ষষ্ঠি পরিচেন্দ

খাদেমুল ফোকারা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)

বেলায়তের দুই যুগের বিকাশ

বেলায়তে মোকাইয়্যাদা এবং বেলায়তে মোত্লাকা

মহান করণাময় আল্লাহতায়ালা প্রত্যেক যুগে তাঁর চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী নবী ও অলিআল্লাহ্গণের দ্বারা যুগ সংস্কার করে খোদা পরিচিতির পথ সহজ ও সুগম করেছেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) এর ওফাতের পর নবুয়ত যুগের অবসান হয়। নবুয়ত যুগ পরবর্তী সময়ে নানা পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মোহাম্মদী দ্বীন-ই-মতিনের অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য সুগঠিত ধর্মে পার্থিব এক্তেলাফ (ভাস্তিগত মিথ্যা) বা মতানৈক্য দানা বেঁধে ইসলামি জগৎ যখন বিভ্রান্তি ও নানা বাধাবিপন্নির সম্মুখীন হচ্ছিল; ঠিক তখন আল্লাহ রাবুল আলামিন ‘মুহিউদ্দিন’ অর্থাৎ ধর্মকে পুনরুজ্জীবনদানকারী উপাধিধারী হযরত পীরানে পীর দস্তগীর গাউসুল আযম হযরত শায়খ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (ক.)-কে^১ যুগোপযোগী ধর্মসংস্কারক হিসাবে বেলায়তে ওজমা’র অধিপতি করে প্রথম গাউসুল আযম ও কুতুবুল আকতাব হিসাবে পাঠালেন। এটা নবুয়ত যুগ শেষ হওয়ার পাঁচশ’ বছর পর ধর্ম নিয়ে মতবিরোধ যুগের প্রথম দাওরা বা বৃত্ত (সময়বৃত্ত বা পর্ব)।

এতোদিন শরিয়তের প্রাধান্যযুক্ত শাসনতন্ত্র পরিচালিত থাকায় হযরত গাউসুল আযম আবদুল কাদের জিলানী (ক.) (৪৭১-৫৬১ হিয়রি) শরিয়ত-ই-ইসলামী মোকাইয�্যাদা অনুসারে তৃরিকতপন্থা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বিল আসালত গাউসুল আযম-ই-এফতেতাহিয়া বা আরম্ভকারী ও বিদ দারাসাত কুতুবুল আকতাব মোকাইয�্যাদায়ে মোহাম্মদী শরিয়তের শাসনাধীন ছিলেন। সেই সময়ে সুলতানুল হিন্দ হযরত গরিবে নেওয়াজ খাজা মঙ্গলুন্দীন চিশতি (ক.)-কে (৫৩০-৬৩৩ হিয়রি) কুতুবুল আকতাব বিল আসালত এবং বড় পীর হযরত গাউসুল আযম আবদুল কাদের জিলানী (ক.) এর মধ্যস্থতায় গাউসিয়ত ফয়েজপ্রাপ্ত হয়ে বিল বিরাসত গাউসিয়তের অধিকারী ও আয়মিয়তের শানে মোতাজাল্লা বা বিকশিত হতে দেখা যায়।

হযরত গাউসুল আযম মুহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী (ক.) এর ফয়েজপ্রাপ্ত এবং তাঁর প্রভাবে পরিচালিত আরো অনেক ‘উলিল আযম’ অলিআল্লাহ্ত দেখা যায়; যাঁদের সবাই শাসন ব্যবস্থার সুবিধা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে শরিয়তে ইসলামী মোকাইয�্যাদায়ে মোহাম্মদী অনুসারে তৃরিকত ব্যবস্থা ও হেদায়েত কাজ পরিচালনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

যুগের প্রয়োজনে উন্নত বেলায়ত বা বেলায়তে মোত্লাকা যুগ: এরপর আবারো ‘ছয়শ’ বছরেরও বেশি সময়ের ব্যবধান ও ইসলামী হৃকুমতের অবসান হওয়ার ফলে ইসলামী ধর্মজগতে বিভিন্ন রকম এক্তেলাফ বা মতানৈক্য দেখা দেয়। তখন পরম করণাময় আল্লাহতায়ালা তাঁর বাতেনি (পবিত্র রহস্যযুক্ত, গোপন) শাসন পদ্ধতির প্রথা অনুযায়ী, সমুচিত হেদায়েত ও উপযুক্ত শক্তিশালী তুরিকার প্রভাবে, জগদ্বাসীকে অঙ্ককার থেকে সহজতমভাবে উদ্ধারের লক্ষ্যে বেলায়তে মোকাইয়্যাদায়ে মোহাম্মদীকে ‘বেলায়তে মোত্লাকায়ে আহমদী’ রূপে পরিবর্তিত করেন; যা বেলায়তের বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন বাধাহীন বিকাশ ও সর্ববেষ্টনকারী বেলায়ত শক্তি। এটি বা বেলায়তের এই ধারা বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদকে নীতিগতভাবে একই দৃষ্টিতে দেখে। কারণ বেলায়তের এই ধারা (বেলায়তে মোত্লাকা) মনে করে যে, বিভিন্ন মতবাদের ‘মত ও পথ’ ভিন্ন ভিন্ন হলেও প্রত্যেকের গন্তব্যস্থল এক। এই বেলায়ত শক্তিকেই বলা যায়, ধর্মজগতের ও সমাজ জীবনের আবর্তন-বিবর্তনমূলক শ্রেষ্ঠতম স্বাভাবিক ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়াবিশিষ্ট যুগ, যাকে বলা যায় বিশ্ববেলায়ত বা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠাতা শক্তি, আরো বলা যায় এ হচ্ছে সনাতন (চিরস্থায়ী, চিরস্তন) ইসলাম।

এই বেলায়ত, জজ্ব (ঐশ্বী অনুভূতি বা দিব্য ভাবাবেগ) ও সলুকের (তপস্যার ধারা বিশেষ) সংমিশ্রণে এর অধিকারীকে নবী করিম (দ.) এর পূর্ণ নবুয়ত ও বেলায়তের যে যুগলুকপ, তার বিকাশ দান করতে সমর্থ হয়, এবং হাদিয়ে মাহদিরূপে হযরত ঈসা (আ.) এর বেলায়তি স্বরূপকে একত্রে (একসাথে) সমাবেশ করতে সক্ষম। মাওলানা রূমি (র.) বলেন: ‘হে পথের সন্ধানী! তোমরা জেনে রাখ, তিনিই প্রকৃত হেদায়েতপ্রাপ্ত ও হেদায়েতকারী, যার নজর বা দৃষ্টি, দৃশ্য ও অদৃশ্য সমস্ত বস্তুতে এক সমান।’^২

গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.) মাঝে মাঝে বলতেন, ‘তুমি আমার সামনে থেকেও যদি স্মরণ বিচ্যুত থাক (তা হলে) তুমি ইয়েমেন দেশে এবং ইয়েমেন দেশে থেকেও যদি আমার স্মরণ বিচ্যুত না হও, তুমি আমার সামনে।’^৩ (ইয়েমেন মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ। সেটি আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত)

বেলায়তে মোত্লাকা যে তৌহিদে আদীয়ানের বা ধর্মগ্রন্থের সমর্থক তার প্রমাণ হিসাবে পবিত্র কোরআন পাকের আয়াত সমূহ এখানে উদ্ধৃত করা হলো।

“যারা খোদা বিশ্বাসী এবং যারা ইছ্দি নাসারা (খুস্টান) কিংবা সাবেয়িন (নক্ষত্র পূজারী), তারা যা কিছুই হোক না কেনো, যদি তারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং সৎকাজ কাজ করে, তার পুরস্কার আল্লাহতায়ালার কাছে রক্ষিত আছে। তাদের কোনো ভয়ভীতি এবং অনুত্তাপ নেই।” (সূরা: বাকারা, আয়াত: ৬২)^৮

মানবজাতির উপর মহান আল্লাহতায়ালা যে দু'টি পবিত্র আমানত অর্পণ করেছেন তা হচ্ছে মারেফত (আল্লাহকে সম্যকভাবে জানার তত্ত্বজ্ঞান) এবং তৌহিদ (মহান আল্লাহতায়ালার একত্রে স্বীকৃতি), সুতরাং ধর্ম, জাতি নির্বিশেষে প্রত্যেকেই এই তৌহিদ ও মারেফতের আমানতের পবিত্র ভার বহনকারী। যারা এই আমানতের আলোকে তাদের কর্তব্য পালন করবে না, তাদের দ্বারা সেই পবিত্র আমানতেরই খেয়ানত হবে। উদাহরণ হিসাবে ইমাম গাজালি (র.) এতদ্সংক্রান্ত বর্ণনা তুলে ধরেছেন। তিনি পবিত্র কোরআনের তিনটি আয়াত তুলে ধরতে গিয়ে বলেছেন, ধর্মসাম্য বা তৌহিদে আদীয়ানের কাছে যে সব ধর্মের নৈতিক লক্ষ্যবস্তু এক এবং কোনো ধর্ম যে, এর কাছে হেয় নয় (অবজ্ঞার বিষয় নয়), এর পোষকতায় (সমর্থন মিলে এমন) এই আয়াতগুলো তুলে ধরা হলো।^৯

“তোমরা কী আল্লাহতায়ালার কোনো কিতাবকে (ঐশ্বর্য) বিশ্বাস এবং কোনো কিতাবকে অবিশ্বাস করো? তোমাদের মধ্যে এরকম যারা করে বা করছে তারা সংসারে অপদৃষ্ট এবং ক্ষেমতের দিন কঠিন আযাবের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে (আযাবের দিকে যাবে)। নিচয় আল্লাহ (নিচয়) তোমরা যা করছে তার সম্বন্ধে অবগত আছেন”। (সূরা: বাকারা, আয়াত: ৮৫)^{১০}

“যারা বলে বেহেশতে নাসারা ও ইছ্দি ছাড়া অন্য কেউ যেতে পারবে না; এটা তাদের মনগড়া কথা। বলুন হে মুহাম্মদ (দ.)! তোমরা যদি সত্য হও, তোমাদের সামনে প্রমাণ উপস্থিত কর”। (সূরা: বাকারা, আয়াত: ১১১)^{১১}

“বরং এটাই সত্য; যে কেউ আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত (ফিরে যায়) এবং সৎ কাজের অনুরাগী হয়, তার জন্য খোদার কাছে পুরস্কার নিহিত (রয়েছে)। তাদের কোনো ভয়ভীতি নেই এবং তারা তিঙ্গতাও অনুভব করবে না”। (সূরা: বাকারা, আয়াত: ১১২)^{১২}

অতএব বুঝা যাচ্ছে, ইছ্দিদের মতো যারা মনে করে বেহেশত কেবল তাদের জন্য, তারাও এই হৃকুমের অন্তর্গত (অন্তর্ভুক্ত)। উপরের আয়াতেকারিমা সমূহের পোষকতায় (সমর্থনে) ‘ঈমান-ই-মুজমাল ও ঈমান-ই-মুফাসসাল’ কালিমাদ্বয়ের মর্মার্থ দেয়া হলো।

“আমি বিশ্বাস করি খোদাতায়ালা বিদ্যমান আছেন। খোদার ফেরেশতা (কর্মকর্তার সূক্ষ্মশক্তি) ও কিতাব সমূহ (ঐশি

ংস্তুসমূহ) সত্য। মহান আল্লাহর প্রেরিত সমস্ত নবী বা প্রেরিত পুরুষদের প্রতি বিশ্বাস রাখি। আমি নবী বা প্রেরিত পুরুষগণের মধ্যে কোনো তারতম্য বা ভিন্নমত পোষণ করি না”।

এই ঈমান-ই-মুজমাল ও ঈমান-ই-মুফাসসাল কালিমাদ্বয়ের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মাওলানা আল্লামা রূমি (র.) বলেন, পাকা ঘরে সূর্যের আলো প্রবেশের পথ জানালা বা বাতায়নকে (খটরকে) তোপ দেগে (কামানের গোলা নিষ্কেপ করে) বিলীন করে দাও, দেখবে আগে জানালা দিয়ে ঘরে আপত্তিত সূর্যের আলো জানালা সমূহের (আয়তনের) অনুপাতে বিভিন্নরূপে দেখা গেলেও জানালা ভেঙ্গে দেয়ার ফলে সূর্যের আলো সমানভাবে আপত্তিত হচ্ছে। সূর্যের আলোতে কোনো ধরনের তারতম্য দেখা যাচ্ছে না। ঠিক সেরকম, বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন নবীগণের বিভিন্ন ধর্মীয় বিধানগত যে পার্থক্য তা তাদের স্ব-স্ব যুগের উপযোগিতা অনুসারে। সেই সাথে তাদের ব্যক্তিত্বের প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন রকম দেখা গেলেও সত্যের মূলে (মূল লক্ষ্যে) নৈতিক ধর্মে ও উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সেখানে কেবল কর্মপদ্ধতির পার্থক্য দেখা যায় মাত্র।

পবিত্র কোরআনুল করিমের সূরায়ে ‘আল আনকাবুত’ এর শেষ আয়াতে (আল আনকাবুত: ৬৯) মহান আল্লাহতায়ালা যে কথা বলেছেন তাতে বুঝা যায়, যারা উপাস্যকে (ইবাদতের যোগ্য একমাত্র আল্লাহকে) বুঝতে ও জানতে চেষ্টা করে এবং সৎকাজের অনুরাগী হয়, আল্লাহতায়ালা তাদেরকে নিশ্চিত ‘হেদায়েত’ বা সৎপথ প্রদর্শন করবেন। যারা সৎকাজ করে, মহান আল্লাহতায়ালা তাদের সাথেই থাকেন।^{১৩}

পবিত্র কোরআনের সূরায়ে ‘আল আহকাফ’-এর ১৩ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহতায়ালা বলেন, “নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না”।^{১৪}

আউলিয়াগণ যাঁরা বেলায়তে মোত্লাকার অধিকারী তাঁরা বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃত ‘শরা’ (ইসলামি বিধানাবলি) অনুযায়ী এলমে তাহকিকি (শুন্দি বিষয় যাচাই করার জ্ঞান) এবং এলমে কাশ্ফ (কাশ্ফী) (কোনো কিছু উন্মোচনের জ্ঞান, বিশেষতঃ তাসাওউফ সাধনায় কোনো বিষয়কে আত্মিক শক্তিবলে জানতে পারা) অনুযায়ী নিজের অধিকার বলে কাজ করেন। অলিয়ে কামেলের কাজ খোদার ইচ্ছাশক্তি ও হেকমত (কর্মকুশলতার অসীম ক্ষমতা) অনুযায়ী হয়ে থাকে। যেহেতু ‘শাইওনাত-ই-তৌহিদি (আল্লাহর ইচ্ছাশক্তি)’ এবং ‘এয়েতেবারাত-ই-অজুনি (আল্লাহর মহান কোশলময় পবিত্র কর্ম)’ সেহেতু এর নাম শরিয়ত। যাকে ইতোপূর্বে ইবাদত-ই মোতনাফিয়া ও মায়ামেলাত-ই-এয়েতেবারিয়া এবং ইলমে তৌহিদি বলে (গুনাহ বিমোচনকারি প্রার্থনা, জাগতিক আগ্রহ বিষয়ে দৈনন্দিন কার্যাবলি এবং মহান আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান) এই গ্রন্থে উল্লেখ করেছি (দ্রষ্টব্য গ্রন্থ: আয়না-ই বারি, পৃষ্ঠা: ৭০৭, ৭০৮)। এটা

রসুমে শরা'র (ইসলামি জীবন-বিধান পদ্ধতির) অনুরূপ না হলেও মূলতঃ শরা বিরোধী নয়, বরং নবী রসূল পাঠানোর হেকমতের (পবিত্র কৌশলের) পর্যায়ভুক্ত কারণ সমূহের শেষ কারণ (দ্রষ্টব্য সমূহ: সূরা আল ইমরান: আয়াত ১৬৪; বেলায়তে মোত্লাকা পৃ. ১৮; ফসুসুল হেকম, ফস্সে ইদ্রিসি আ. পৃ. ১১১ এবং ফস্সে ওজাইরি আ. পৃ. ১৭৭)। অতএব অলিয়ে কামেলের কাজ মহান আল্লাহতায়ালার ইচ্ছাক্ষিণি ও হেকমত (পবিত্র কৌশল) দ্বারাই হয় (ফসুসুল হেকম, ফস্সে ওজাইরি আ. পৃ. ১৭৭)।

“তুমি যখন নবীকে মকাম-ই-শরিয়াহ’র বাইরে কথা বলতে শুনো, তখন মনে করো এটা তাঁর খোদা পরিচিতি অর্জন এবং অলি হওয়ার কারণে তিনি একথা বলছেন। এই কারণে তাঁর আলেম-ই-আরিফ (জ্ঞানী ব্যক্তি যিনি খোদাকে জানেন) ও অলিআল্লাহ হওয়ার মর্তবা (মর্যাদা), সাহেব-ই-শরিয়াহ (শরিয়তের সম্মানিত ব্যক্তি) ও নবী হওয়ার মর্তবা থেকে অগ্রবর্তী”^{১১} কারণ আলেম হচ্ছেন তিনি প্রকার। যেমন: ‘এক: আলেম বিল্লাহ লা-বে আমরিল্লাহ, দুই: আলেম বে আমরিল্লাহ লা-বিল্লাহ, এবং তিনি: আলেম বিল্লাহ ওয়া বে আমরিল্লাহ’। প্রথম ব্যক্তি খোদার জ্ঞান রাখেন বটে খোদার হৃকুমের খবর রাখেন না। তাই যাঁরা মজ্জুবে মাহাজ তাঁরা শরা বা শরিয়াহ’র তকলিফ (বিধি অনুসরণের দায়) থেকে মুক্ত, যেহেতু ভাব-বিভোরতার কারণে তাঁর বাহ্যিক জ্ঞান লুপ্ত। দ্বিতীয় স্তরের ব্যক্তি শরাহ, শরিয়ত বিধিব্যবস্থা, বিদ্যা সম্পর্কে অবগত। কিন্তু খোদার পরিচয়হীন, তিনি শুধু সৎসারধর্মী। তাই মাওলানা রূমি (র.) বলেন, যদি তুমি খোদার সঙ্গে মিথ্যা দুনিয়ার মোহ, লোভকে কামনা করো, তবে তা হবে পাগলামি ও অসম্ভব।^{১২} আর তৃতীয় স্তরের আলেমই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ আলেম, নায়েবে নবী (নবীর সহকারি বা প্রতিনিধি)। ইনি খোদা সম্পর্কিত জ্ঞানে জ্ঞানবান (মহান আল্লাহতায়ালাস সম্পর্কে অবগত) এবং আহকামেরও (ঐশি বিধান সমূহের) খবর রাখেন, যেমন হয়রত খিজির (আ.)।

উপরে উল্লিখিত বেলায়তে মোত্লাকার অধিকারী হচ্ছেন এই তৃতীয় স্তরের অলিআল্লাহ। (তিনি) বিশ্ববাসী সকল ধর্মাবলম্বীকে কারো আচার-ধর্মে বাধা না দিয়েও নেতৃত্ব ক্ষেত্রে একত্রিত করতে সমর্থ। কারণ বেলায়তে মোত্লাকা কোনো প্রকার ধর্মীয় বিরোধকে সমর্থন করে না; বরং এটা রোষ-বিবর্জিত এবং গন্তব্য পথের মূল উদ্দেশ্য অনুসারেই বিচার করে থাকে। উপরে উল্লিখিত বিষয়াদির পোষকতায় (সমর্থনে) ১৩৭২ বাংলা সনের ২৭শে চৈত্র তারিখে চট্টগ্রামের দৈনিক আজাদী-তে প্রকাশিত তিনি জন খ্যাতনামা ব্যক্তিত্বের উক্তি নীচে উন্নত করলাম।

চট্টগ্রাম বার কাউলিলে পাকিস্তানের বিচারপতি কর্নেলিয়াসের প্রেরিত বাণী:

“পাকিস্তানের জনসাধারণ আইনের ন্যায়নীতি এবং এর

প্রয়োগবিধি সম্পর্কে ওয়াকেফহাল রয়েছেন। ধর্মবিশ্বাস থেকেই তাদের এই শিক্ষা লাভ। জনসাধারণ যদি শরিয়তের বিধি ও ন্যায়নীতির প্রতি সচেতন থাকে তাহলে নেতৃত্বাতার দিক দিয়ে তারা অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকবে।”

পাকিস্তানের ভূতপূর্ব কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী এস এম জাফরের উক্তিতে উন্নতি:

“মানুষের সমাজ যেহেতু পরিবর্তনশীল, সমাজ বিকাশের প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে আইনেরও সংযোজন ও রদবদল প্রত্বিত নিয়মিতভাবে হওয়া প্রয়োজন।” (ইমাম শাফি (র.)-এর অভিমত)^{১৩}

মুক্তায় ভোজসভায় সৌদি আরবের বাদশাহ ফয়সলের অভিমত:

“ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলাম জ্ঞানের ধর্ম। ইসলাম প্রগতির ধর্ম। এমন কোনো ভাল মতবাদ নেই, যা ইসলামে নিহিত নেই; এমন কোনো খারাপ কাজ নেই যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার নির্দেশ ইসলামে নেই।”

বেলায়তে মোত্লাকা শরিয়তের (ইসলাম ধর্মের বিধি-বিধান) বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করতে না পারলেও হাকিকত (বাস্তবতা) বা এর উদ্দেশ্যস্থলের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে। যেমন: কোনো পাহাড়ি ব্যক্তি, যার কাছে নবীর দাওয়াত বা আহ্বান পৌছার সুযোগ হয় নি, তার জন্য শুধু স্রষ্টা এক, এটুকু বিশ্বাসই নাজাতের (মুক্তি বা পরিত্রাণ) জন্য যথেষ্ট। কোনো নবীর উপর দুর্মান বা বিশ্বাস আনা এবং ধর্মের অন্যান্য নির্দেশাবলি পালন না করার জন্য তাকে দায়ী করা হবে না। একথা সর্ববাদিসম্মত (সব ধরনের মতাবলম্বীর জন্য সত্য)। এযুগে স্তুপাকার বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ, বৈজ্ঞানিক ভাবধারার যুক্তির বেড়াজাল; নাস্তিকতা ও বস্ত্রবাদের মনোরম সাহিত্য ভাগীর থেকে কেউ যদি সঠিক ধর্মের ডাক হৃদয়ঙ্গম করে বেছে নিতে সক্ষম না হয়, তাকে কী ঐ পাহাড়ি ব্যক্তির পর্যায়ভুক্ত করে শুধু তৌহিদ বা একেশ্বরবাদের স্বীকৃতির (ব্যর্থতার) জন্য দায়ী গণ্য করা সমীচীন নয়?

উপরন্ত পৃথিবী পরিব্যাপ্ত শিরক (আল্লাহর একত্রে বিরোধী কাজ) ও নাস্তিকতাবাদের আওতা থেকে মানবজাতিকে সোজাসুজি “আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতে”র মাধ্যমে মুসলমানে ঝুপান্তরের ভাবধারাকে ইতিহাস বাস্তবক্ষেত্রে অবাস্তর প্রমাণ করেছে। এরপরও পৃথিবীতে মহান আল্লাহপাক সম্পর্কিত ব্যাপক আহ্বান কীভাবে পৌছানো সম্ভব?

মহান আল্লাহতায়ালা নির্দেশ দিচ্ছেন: “ভাল উপদেশ ও কৌশল বা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে (মানব জাতিকে) তোমার প্রভুর পথে আহ্বান করো।” (সূরা: নাহল, আয়াত: ১২৫)^{১৪} এই আয়াতের মর্ম অনুসারে মানবজাতিকে যদি পাকা (খাঁটি) মুসলমান করে নেয়ার ক্ষেত্রে সৃষ্টি করা বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকর

হচ্ছে না বলে প্রতীয়মান হয়, তবে তাদেরকে অন্ততঃ তৌহিদের (আল্লাহর একত্ববাদের) আওতাভুক্ত করার প্রয়াস ছাড়া গত্যন্তর নেই।

ভারতবর্ষে মহান অলিআল্লাহ খাজা মঙ্গলুদ্দিন চিশতি (ক.) ও তাঁর পরবর্তী অলিআল্লাহ ও বুজুর্গগণের আবির্ভাব, ইসলাম প্রচার ও তাঁদের পবিত্র রূহানি শক্তির প্রভাব বিস্তৃত হওয়ার ফলে আজ পাক-ভারতে পনর কোটিরও বেশি মুসলমান (বর্তমানে ভারতবর্ষে মুসলমানের সংখ্যা ২০ কোটিরও অধিক) দেখা যায়। সেই সাথে দেখা যায়, রামানন্দ, রামানুজ, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রী শ্রী লোকনাথ, নানক, কবির, রাজা রামমোহন রায়, ব্ৰহ্মবাদী শ্রী চৈতন্য প্রমুখ, হিন্দু পৌত্রলিকতা থেকে দূরে সরে এসে ইসলাম গ্রহণ না করলেও তৌহিদের প্রতি স্বীকৃতি জ্ঞাপন করছেন। বস্তুত: একেশ্বরবাদ কী পৌত্রলিকতা থেকে ইসলামের দিকে অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী নয়? এটা কী ইসলামী রূহানিয়তের (পবিত্র আত্মিক বা আধ্যাত্মিক শক্তিময়তার) অবদান নয়? তৌহিদের স্বীকৃতি দিয়েছে বলে যদি আল্লাহপাক তাদেরকে নাজাত (মুক্তি বা নিষ্কৃতি) দেন, তাতে কারো আপত্তি করার কী কোনো কারণ আছে? পৌত্রলিকতা ও শিরকের মধ্যে অন্ততঃ: স্বষ্টার প্রতি স্বীকৃতি আছে; কিন্তু নাস্তিকতাবাদে সেই স্বীকৃতিটি পর্যন্ত নেই। অথচ বর্তমান যুগে নাস্তিকতাবাদ ও ধর্মীয় গোড়ামিবাদ সমন্বিত জগতকে গ্রাস করে নেয়ার উপক্রম করছে এবং সবখানে সংঘাত-বিরোধই বাড়িয়ে চলছে।

পক্ষান্তরে পবিত্র কোরআনুল হাকিমের সূরা আশ-শুরা'র ১৫ নম্বর আয়াতের ভাষায় মহানবী হ্যরত মুহাম্মদ (দ.) বর্ণনা করেন:

“আমি তোমাদের সঙ্গে কাজ কারবারে ‘আদল’ বা বিচারসাম্য রক্ষা করতে আদিষ্ট হয়েছি। যেহেতু আল্লাহতায়াল্লা আমাদের যেমন পালনকর্তা তেমনই তিনি তোমাদেরও পালনকর্তা। আমাদের কাজকর্ম, ধর্মাচরণ আমাদের জন্য, তোমাদের কাজকর্ম ও ধর্মাচরণ তোমাদের জন্য। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনো ‘হ্জজ্জত’ বা বিরোধ নেই। আল্লাহপাক একদিন আমাদেরকে তৌহিদ বা অদ্বৈত সমাবেশ স্তরে একত্রিত করবেন। যেহেতু সবাইই সেই সৃষ্টির মূলাধার জাত-ই-পাকের দিকে প্রত্যাবর্তনশীল। এই তৌহিদ ‘জময়ানি’ বা সমাবেশকারী, বিশ্ববাসীকে একই নৈতিক ক্ষেত্রে সমবেত করতে সমর্থ ও আদল-ই-মোত্লাকের (নির্বিকার সাম্যের) যোগ্যতা সম্পন্ন।”^{১৫} (‘জময়া’ শব্দের অর্থ এই গ্রন্থের দশম পরিচ্ছেদে তফসির-ই-ইবনে আরাবি’র পাদটীকা-৩ ‘জের নোট’ দ্রষ্টব্য। এটা জময়ানি বা সমাবেশকারী ভাবধারাসংযুক্ত সুফি মতবাদের বিশিষ্ট ধ্যানধারণা। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা মওজুদা ইল্লাল্লাহ, অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য বস্তুর হাস্তি বা অন্য বস্তুর অস্তিত্ব মিথ্যা।)

পৃথিবীকে এই পৌত্রলিকতাবাদ, নাস্তিকতাবাদ ও ধর্মীয়

গোড়ামিবাদ থেকে রক্ষা করার জন্য এক বিরাট কার্যকরি রূহানি শক্তি ও তার নিয়ন্ত্রণাধীন এক মহাকৌশল বা হেকমতের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সেই বিরাট শক্তির সূচনা হ্যরত-ই আকদাস হ্যরত গাউসুল আয়ম সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাগুরীর (ক.) জাত-ই-বরকতে (কল্যাণকর শুভ আগমনে) হয়েছে, আর সেই মহাকৌশল বা হেকমতের নাম “বেলায়তে মোত্লাকা”।

সারানুবাদ: ড. সৈয়দ আবদুল ওয়াজেদ

তথ্যসূত্র ও টীকা:

১. পীরানে পীর দস্তগীর গাউসুল আয়ম হ্যরত শায়খ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (ক.) (জন্ম: ৪৭১ হিয়রি, ওফাত: ৫৬১ হিয়রি)
২. মসনবি শরিফ, মাওলানা আল্লামা জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ রুমি (র.)
৩. গাউসুল আয়ম হ্যরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক.)-এর পবিত্র কালাম
৪. আল কোরআন, সূরা:বাকারা, আয়াত: ৬২
৫. আল কোরআন এর আলোকে ‘মাআরেফাত’ ও ‘তওহিদ’ বিষয়ে হ্যরত ইমাম গাজালি (র.)-এর বর্ণনা
৬. আল কোরআন, সূরা: আল বাকারা, আয়াত: ৮৫
৭. আল কোরআন, সূরা: আল বাকারা, আয়াত: ১১১
৮. আল কোরআন, সূরা: আল বাকারা, আয়াত: ১১২
৯. আল কোরআন, সূরা: আল আনকাবুত, আয়াত: ৬৯)
১০. আল কোরআন, সূরা:আল আহকাফ, আয়াত: ১৩
১১. ফসুসুল হেকম, হ্যরত ইবনে আরাবি (র.), অনূদিত উর্দু সংক্ষরণ, মন্তকফারী প্রেস লক্ষ্মী
১২. মসনবি শরিফ, মাওলানা আল্লামা জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ রুমি (র.)
১৩. ইমাম শাফি (র.)-এর অভিমতের উন্নতি
১৪. আল কোরআন, সূরা: নাহল, আয়াত: ১২৫
১৫. আল কোরআন, সূরা: আশ-শুরা, আয়াত: ১৫

সহায়ক গ্রন্থ:

- ক. ড. মুহাম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী অনূদিত '*BELAYET-E-MUTLAKA*' (*The Unchained Divine Relations or Unhindered Spiritual Love of God*), ইংরেজি দ্বিতীয় সংক্ষরণ, ২০১৭, প্রকাশনী: আঙ্গুমান-ই-মুত্তাবেয়িন-ই-গাউস-ই-মাইজভাগুরী, চট্টগ্রাম।
- খ. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, সংকলন ও সম্পাদনা: মোহাম্মদ হারুন রশিদ, প্রথম প্রকাশ: জৈষ্ঠ ১৪২২/ মে ২০১৫, বাংলা একাডেমি, ঢাকা বাংলাদেশ

বিশ্ব নবী হ্যরত মুহাম্মদ (দ.) এর তাসাওউফ ধারা

● অধ্যাপক জহুর উল আলম ●

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তাসাওউফ ধারায় হ্যরত পরবর্তী মদিনা সাধারণতন্ত্র ব্যবস্থা
এবং জিহাদের প্রভাব :

পবিত্র জন্মভূমি মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের পর বিশ্বনবী
হ্যরত মুহাম্মদ (দ.) নির্মাণ করেন মসজিদে নবী। এ মসজিদ
একদিকে আল্লাহর ইবাদতের পবিত্র গৃহ এবং একই সঙ্গে
সর্বসাধারণের মিলন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠে। আনুষ্ঠানিক
সালাতের পর চলতো পারস্পরিক খবরাখবর এবং মতবিনিময়
এবং সমস্যা-সংকট সম্পর্কে মতামত ও আলোচনা। দ্বিতীয়
হিজরী সনে কিবলা পরিবর্তনের পর পরীক্ষামূলক প্রথম কিবলা
বায়তুল মোকাদ্দাসমুখী স্থানে মসজিদে নবীর অভ্যন্তরে
দেয়াল তুলে দেয়া হয়। এ স্থানে গড়ে তোলা হয় ঘর বাড়ি
এবং ঠিকানা বিহীন নিঃস্ব নিঃসম্বল গরিব মুসলমানদের
অবস্থান ও আবাসস্থল। স্থানটি সুফ্ফা নামে পরিচিত। এখানে
অসহায় মুসলমান এবং উপবাস ও সুকঠিন কষ্টে থেকেও
আল্লাহর উপর সর্বক্ষণ নির্ভরশীল শোকর গুজার মানুষেরা
অহর্নিশ পড়ে থাকতেন মহানবী (দ.) এর অমৃত বাণী এবং
শাশ্বত নির্দেশ শুনার জন্যে। এ সকল মানুষগুলো ছিলেন
দারিদ্রে আত্মত্পুর এবং সদাহাস্য। তাঁরা কখনো কারো নিকট
কোন প্রকার সাহায্যের প্রত্যাশী ছিলেন না এবং কারো নিকট
কখনো যাচিত ভাবে কিছু চাইতেন না। তাঁরা ছিলেন ‘আসহাবে
সুফ্ফা’। তাঁরাই হলেন পার্থিব স্বার্থ- লোভ লালসা বিমুখ
তাসাওউফ সাধকদের প্রথম দল। নামাযের পর মসজিদের
সম্মুখস্থ চতুরে পার্থিব বিষয়ে কল্যাণময় সমাধান ও
নির্দেশনাসূচক আলোচনা এবং মসজিদের অভ্যন্তরে
সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহর জিকির রত আসহাবে সুফ্ফার
অবস্থান-এ যেন রাসূলুল্লাহ (দ.)-এর হক্কুল্লাহ এবং হক্কুল
ইবাদের সুগভীর ও অভিন্ন সম্পর্কের প্রায়োগিক রূপরেখা। এটি
ইসলামী জীবন বিধান জগত এবং তাসাওউফ জগতের
সম্মিলন নয় বরং কোরআন নির্দেশিত ইসলামী জীবনাচারের
আক্ষরিক উপমা। এ ধরনের একাথ একীভূত জীবনাচারকে
যখন পৃথক করে পার্থিবতা এবং ধার্মিকতা পরিচয়ে স্বতন্ত্র
শিরোনামে চিহ্নিত করা হয় তখন তা পার্থিব ব্যক্তি স্বার্থ
কেন্দ্রিক নানামুখী কপটাচারীর নিয়ম-কানুনের সংযুক্তিতে
সেকুলার জীবন ধারা হিসেবে পরিচিতি পায়। ইসলামের
ইতিহাসসমূহে বিভিন্ন বর্ণনায় খোলাফায়ে রাশেদীনের পরিবর্তে
রাজতন্ত্র প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে সেকুলার জীবন ধারা সম্পর্কে
স্পষ্ট ধারণা দেয়া হয়েছে।

বিশ্বনবী হ্যরত মুহাম্মদ (দ.) পৃথিবীবাসী সকল মানুষের নবী
হিসেবে আল্লাহ রাবুল আলামীন কর্তৃক ঘোষিত হয়ে দায়িত্ব
গ্রহণ করায় মদিনায় পৌছে সুস্থিরভাবে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী

মদিনাবাসীকে পারস্পরিক কল্যাণের জন্যেও ঐক্যবন্ধ করে
“মহাজাতিক মানবধারা” প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি সংবিধানের
ভিত্তিতে সংগঠিত করার উদ্যোগ নেন। মদিনায় অবস্থানরত
বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী নেতা এবং গোত্র নেতাদের সম্মতি সাপেক্ষে
তিনি মদিনা সনদ রচনা করেন। মদিনা সনদ মূলত: রাষ্ট্রীয়
সংবিধান হিসেবে স্বীকৃত হয়। উল্লেখ্য যে, তৎকালে মদিনায়
বসবাসরত বিভিন্ন গোত্রীয় নেতারা গোত্রের জনগণের সম্মতি
সাপেক্ষে গোত্রীয় দায়িত্ব গ্রহণ ও পালন করতেন। মদিনা সনদ
অনুযায়ী মদিনায় বসবাসরত ইহুদী, খ্রিস্টান, মুসলমান,
পৌরাণিক প্রভৃতি ধর্ম বিশ্বাসী এবং আচারবাদী লোকের সকল
বিষয়ে নাগরিক সমানাধিকার ভোগের বিষয় স্বীকৃত ছিল।
সনদের প্রধান শর্ত ছিল পারস্পরিক বিশ্বস্ততার ভিত্তিতে মদিনা
সাধারণতন্ত্র এবং মদিনাবাসীদের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা
সংরক্ষণে ঐক্যবন্ধ থেকে সমাজ সংহতি সুদৃঢ় করা। সনদ
অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্ম পালনের পূর্ণ
অধিকার প্রাপ্ত হয়। এতে সকল নাগরিকের কর্মকাণ্ডের ভিত্তি
হিসেবে “বিচার সাম্য”কে ন্যায়ের মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা
হয়। একই সঙ্গে ধর্মবিশ্বাস ভেদে ধর্ম গ্রন্থের নির্দেশ ও নিয়ম
অনুযায়ী অপরাধের বিচার ও শাস্তির বিধান সংরক্ষিত হয়। এ
ব্যাপারে মদিনা সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার কারণে
ইহুদীদের শাস্তি প্রদান সম্পর্কে অনুসৃত ধর্মগ্রন্থ তাওরাতে
নির্দেশিত বিষয়টি একটি বিশেষ উদাহরণ। মদিনা সাধারণতন্ত্র
ব্যবস্থার কেন্দ্র হিসেবে মসজিদে নবী সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত
হয়। সুতরাং মদিনা সাধারণতন্ত্রের প্রাণকেন্দ্র মসজিদে
নবীতে নামাযের সময় ব্যতীত রাষ্ট্র পরিচালনা এবং আর্থ
সামাজিক সমস্যা ও প্রয়োজনে সকল মানুষের যাতায়াত ছিল
প্রত্যাশিত এবং অবারিত। মনিদাবাসীকে এইভাবে
সাংবিধানিক ধারায় রাষ্ট্র কাঠামোতে ঐক্যবন্ধ করে বিশ্বনবী
(দ.) পৃথিবীর বুকে বিভিন্ন মানব সম্প্রদায়ের শাস্তিপূর্ণ
সহাবস্থান এবং পারস্পরিক নৈকট্য অর্জনের যে আক্ষরিক চিত্র
পৃথিবীবাসীর নিকট উম্মোচন করেন তা হলো সকল
মানবগোষ্ঠীর জন্যে ‘মহাজাতিক’ ব্যবস্থা।

‘মদিনা সনদ’ ভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে উঠলে বিশ্বনবী (দ.)
এবং তাওহীদ ও ইসলাম বিদ্বেষী বহিঃশক্তি বিশেষত
মক্কাবাসীরা এ রাষ্ট্র কাঠামো চুরমার করে দেয়ার জন্যে বিভিন্ন
রকম ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্তের পাশাপাশি সামরিক অভিযানের
উদ্যোগ নেয়। ফলে আত্মরক্ষা এবং মদিনা সাধারণতন্ত্রের
অস্তিত্ব ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার লক্ষ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে শক্তির
আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে জিহাদের নির্দেশ আসে। জিহাদ
সম্পর্কিত নির্দিষ্ট আয়াত নাযিল হবার পর প্রতিপক্ষের আক্রমণ
প্রতিরোধ এবং প্রতিহত করার জন্যে প্রথমে বদর যুদ্ধের সূচনা

ঘটে। স্বল্প সংখ্যক অন্তর্ভুক্ত নিয়ে ৩১৩ জনের একটি ক্ষুদ্র অংশ দৃঢ়প্রতিভাব সুশৃঙ্খল বাহিনী পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল থেকে প্রতিপক্ষের সহস্রাধিক সবল বাহিনীকে পরাজিত করে নিজেদের শক্তিমন্ত্র পরিচয় দেয়ায় বদর যুদ্ধ পৃথিবীর তৎকালীন শক্তিধর রাজা বাদশাহকে হতচকিত ও আতঙ্কিত করে তোলে। আত্মরক্ষা এবং তাওহীদের নিশান উভয়ীন রাখার স্বার্থে বিশ্বনবী (দ.) কে মদিনারাষ্ট্রের বাইরে এবং অভ্যন্তরে সশস্ত্র আক্রমণ এবং নানামুখি চক্রান্ত প্রতিহত করার লক্ষ্যে প্রায় ৮৭টি যুদ্ধ এবং সংঘর্ষে লিঙ্গ হতে হয়। মূলতঃ তাওহীদ প্রচার এবং ধর্ম বর্ণ নৃগোষ্ঠীর বিচ্ছিন্ন-বিভিন্নতার প্রতি হিংসা-বিদ্বেষহীন ইসলাম ধর্মের সাম্যবাদী কাঠামো ও চিত্র উপস্থাপনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীদের সঙ্গে এ সকল যুদ্ধ মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংঘটিত হয়।

বিশ্বনবী (দ.) প্রণীত মদিনা সনদের ভিত্তিতে কিছু দুর্ভাগ্যজনক ঘাত প্রতিঘাতের মাধ্যমে ত্রিশ বছর খোলাফায়ে রাশেদীনের গৌরবময় সময় অতিবাহিত হয়। শেষ খলিফা হযরত সৈয়দিনা হাসান (রা.) উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে আমীর মোয়াবিয়ার সঙ্গে চুক্তির ভিত্তিতে খিলাফত পরিত্যাগ করেন। হযরত হাসান (রা.) এর পর খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়কালের পরিসমাপ্তি ঘটে। রাসূলুল্লাহ (দ.) এর বাণী অনুযায়ী দেখা যায় ত্রিশ বছর খিলাফত ব্যবস্থা চলার পর আমীর মোয়াবিয়ার মাধ্যমে পারিবারিক বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের সূত্রপাত ঘটে। আল্লাহর পক্ষ থেকে জনসাধারণের কল্যাণের লক্ষ্যে সম্পদ ও মালামাল সংরক্ষণের জন্যে গঠিত বায়তুল মাল তথা রাষ্ট্রীয় কোষাগার ‘রাজ কোষাগারে’ পরিণত হয়। খলিফা নির্বাচনের ক্ষেত্রে জনগণের অভিমত পরিত্যক্ত হয়। দেশ পরিচালনার সমগ্র ব্যবস্থা রাজানুগত ব্যক্তি এবং রাজবংশের উপর অর্পিত হয়। সৃষ্টি হয় শাসক-শাসিতের মধ্যে অধিকার সম্পর্কিত বৈষম্য। ভোগ-বিলাস এবং অন্যায় অপকর্মের বিরুদ্ধে সামান্য প্রতিবাদেও রোমান-পারস্যের সীজার-সম্রাটদের মতো দমন প্রক্রিয়া চালু করা হয়। গোত্রীয় কর্তৃত এবং দীর্ঘস্থায়ী উমাইয়া বংশীয় শাসনের অভিলাষ পূরণকল্পে সাধু সরল সজ্জন খলিফা হযরত উসমান (রা.)-এর উপর প্রভাব এবং চাপ সৃষ্টি করে হযরত আবু যর গিফারীর (রা.) মতো নৈর্ব্যক্তিক চরিত্রের মহাসাধক সাহাবাকে নির্বাসন দণ্ড প্রদান করা হয়। মসজিদে নববীর অভ্যন্তরে নির্ধারিত হন হযরত আম্মাৰ ইবনে ইয়াসির (রা.) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা.)-এর মতো নির্ভিক পরম সত্যবাক, কল্যাণ পথের চিরন্তন অভিসারী সাহাবাদ্বয়। হযরত উসমান (রা.) এর শাহাদতের পর সাহাবাদের মধ্যে নৈতিক ধারণা প্রশ্নে বিভক্তি নেমে আসে। পুণ্যবান সাহাবীরা অতি স্বত্ত্বে রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে ধীরে ধীরে সরে আসতে থাকেন। এ পর্যায়ে ক্ষমতালুপ কিছু

ব্যক্তি ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে সুবিধা গ্রহণের নানাবিধ চক্রান্ত নিয়ে এগুতে থাকেন। চক্রান্তকারীদের একটি অংশ উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.), পুণ্যবান সাহাবী হযরত তালহা এবং হযরত যুবায়ের (রা.) কে ব্যবহার করে আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে অন্ত ধারণ করে ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনায় প্রথম বিভক্তির সূত্রপাত ঘটায়। ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের একটি দল হযরত আলী (রা.)-এর সমর্থক সেজে নিজেদেরকে আত্মগোপন রেখে উষ্ট্রের যুদ্ধ সংঘটিত করে। সিফফিনের যুদ্ধের ফলে হযরত আলীর (রা.) শিবিরে মুনাফেকদের একটি দল অবস্থান করায় সিরিয়ার গভর্নর আমীর মোয়াবিয়া পরাজয়ের প্রান্ত সীমানায় উপনীত হয়ে কুটিল কৌশলের মাধ্যমে রক্ষা পান এবং পরবর্তী সময়ে শান্তি বৈঠকে ফয়সালার নামে অসত্য প্রস্তাবনার ভিত্তিতে আরবের রাজনৈতিক ক্ষমতা উমাইয়াদের দখলে আসে। চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.)-এর শাহাদতের পর পঞ্চম খলিফা হযরত হাসান (রা.)-এর সাথে সন্ধি করে আমীর মোয়াবিয়া দামেককে রাজধানী করে আরবে রোমান-পারস্য ধারার রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। খিলাফত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে একশেণির ক্ষমতালোভী ব্যক্তি সম্পর্কে তায়কেরাতুল আউলিয়া গ্রন্থের প্রণেতা তাপসকুল শিরোমণি হযরত শেখ ফরিদ উদ্দীন আভার (রহ.) তাঁর “মানতিকৃত তায়র” কিতাবে একটি ঘটনার বিবরণী উপস্থাপন করেছেন। বিশ্বনবী (দ.) এর নির্দেশ অনুযায়ী দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক (রা.) এবং বেলায়তের সন্মাট হযরত আলী (রা.) রাসূলুল্লাহ (দ.) প্রদত্ত খিরকা দুনিয়া বিমুখ সাধক অলিকুল শিরোমণি হযরত ওয়ায়েস করণী (রহ.)’র নিকট সোপন্দ করার নিমিত্তে ইয়েমেনের করণ এলাকায় গমন করেন। গভীর অরণ্যে একাকী কঠোর সাধনারত অবস্থায় তাঁরা হযরত ওয়ায়েস করণীর (রহ.) সাক্ষাত পান। আল্লাহ এবং রাসূল (দ.)-এর প্রতি প্রেম সম্পর্কিত সুগভীর মনোপ্রেণামূলক কামনা-বাসনা-লোভ লালসা বিমুখ পারম্পরিক আলোচনা ও কথোপকথনের এক পর্যায়ে হযরত উমর ফারুক (রা.) প্রেমাবেগে বলে উঠেন, “আমি আমার ওপর অর্পিত খিলাফতের দায়িত্ব হেড়ে দেব। রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব যদি ক্রয় বিক্রয়যোগ্য কোন ব্যাপার হতো, তাহলে তা (সর্বনিষ্ঠ) এক টাকাতেই বিক্রয় করে ফেলতাম।” হযরত উমর ফারুকের (রা.) যবানীতে এ ধরনের বক্তব্য শুনে হযরত ওয়ায়েস করণী (রহ.) বলেন, “আপনি যেমন আছেন তেমনি থাকেন, দায়িত্ব চালিয়ে এবং নিশ্চিন্তে দায়িত্ব পালন করে যান। আপনি তা এমন কাউকে অর্পণ করবেন যারা তা কামনা করে (অর্থাৎ খিলাফতের জন্যে আগ্রহী) তাহলে (খিলাফত ব্যবস্থা) ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং আপনি জবাবদিহিতার মুখোমুখি হবেন।” হযরত আলী (রা.) এর সম্মুখে হযরত উমর (রা.) এবং হযরত ওয়ায়েস করণী’র (রহ.) কথোপকথন থেকে বুঝা যায় যে সে সময়ে একশেণির লোকের মধ্যে খিলাফত পরিচালনা তথা রাষ্ট্র

ক্ষমতা গ্রহণের মনোবাসনা লুকায়িত ছিল। হ্যরত উসমান (রা.) এবং হ্যরত আলী (রা.)-এর খিলাফতকালে এ ধরনের মনোবাসনা ব্যাপক রক্তক্ষয়ী ফিতনা হিসেবে প্রকাশ পায়। এ ধরনের বে ইনসাফী রক্তারক্তি এবং ফিতনা-ফ্যাসাদ থেকে আত্মরক্ষার লক্ষ্যে অনেক সাহাবা সুকঠিন রিয়াষত এবং ধ্যানমগ্ন ইবাদতে মশগুল হয়ে পড়েন। কিছু কিছু ব্যক্তির কুটিলনীতি এবং অপকৌশলকে তাঁরা অনৈতিক এবং ইসলাম ধর্মের মূল আকৃতির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করে আল্লাহর আরাধনায় লিঙ্গ থেকে আত্মসংযমে পরিচালিত হয়ে নিজেদেরকে উন্নত নৈতিকতার উপর হিসেবে উম্মাহর সম্মুখে উপস্থিত রাখেন। তাঁরা লক্ষ্য করেন যে খোলাফায়ে রাশেদীনের পর মদিনা সনদ ভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা ব্যক্তি মর্জিতাত্ত্বিক রাজতন্ত্রের দিকে ধাবিত হয়। এহেন পরিস্থিতিতে সাহাবা কিরামের একটি সুমহান দল মদিনা সনদের আদর্শকে তাঁদের পবিত্র অন্তরে ধারণ করে পার্থিব ভূ-রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তে অন্তরের অন্তস্থলে গভীর মমতায় হকুম্মাহ এবং হকুল ইবাদের মিশন নিয়ে মানবতার কল্যাণ সাধনে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখেন। এ দলের লালিত আদর্শ তথা তাওহীদ এবং ইসলাম ধর্মের মৌলিক ধারা পুনঃপ্রতিষ্ঠার গ্রীষ্মী তাগিদে বিশ্বনবী (দ.)-এর আধ্যাত্মিক নির্দেশনায় দাঙ্গিক দুরাচারী জালিমের বিরুদ্ধে অসীম সাহসে ফোরাতের কুলে কারবালা প্রান্তরে প্রতিরোধ গড়ে তুলে শাহাদত বরণ করে পবিত্রতম হাউজে কাওসার পান করে বিশ্ব ভক্ষাণে সত্ত্বের অনুপম সাক্ষী হন আখেরী নবী (দ.)-এর পরম প্রিয় দৌহিত্র হ্যরত ইমাম হোসাইন (রা.)। ইসলামের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করে লক্ষ্য করা যায় যে, কারবালা প্রান্তরের নির্মম ঘটনাপঞ্জীর পরিপ্রেক্ষিতে জীবিত সাহাবা কিরাম এবং আদর্শপ্রাণ উৎসর্গপ্রবণ উন্মত্তদের মধ্যে রাজনীতি এবং রাষ্ট্রক্ষমতা বিমুখ ধারা তীব্রতর হয়ে উঠে। মূলতঃ কারবালা শহীদানন্দের পবিত্র শোগিতে ইসলাম ধর্মের আসল ঠিকানা নতুনভাবে চিহ্নিত হয়ে যায়। কারবালার আদর্শ ধারণ করে এবং লোভ-লালসা বাসনা-কামনা মুক্ত সাহাবা-তাবেয়ীনদের স্বচ্ছ দিলের একটি পরিশ্রমী দল তখন অতিদ্রুত বেলায়তের ঝাণা উর্ধ্বে উত্তোলন করে উন্নতনৈতিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে তাসাওউফ ধারার সুবিশাল বিকাশে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁরা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের নিকট সুফি, দরবেশ, ফকির-সাধক হিসেবে সমাদৃত হন। মদিনা সনদভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে উঠার পর বিশ্বনবী (দ.)'র নির্দেশে পৃথিবীব্যাপি শান্তি এবং এক অবিনশ্বর-অবিতীয় আল্লাহর প্রতি পরম আনুগত্যের বাণী নিয়ে সাহাবা কিরামের অভিযাত্রা ছিল একটি দাওয়াতী মিশন। এই মিশন রাজ্য দখলের জন্যে ছিল না। এ মিশন ছিল ধর্ম, বর্ণ, জাতি- গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকল মানুষের মনোজগতে মহান আল্লাহর প্রতি অসীম প্রেমধারা সৃষ্টিকল্পে সত্য এবং ন্যায়বোধে মানব বিবেক জাগ্রত করার মিশন। এ সময় কারো সঙ্গে কলহ বিরোধ না করে বিশ্বনবী (দ.) প্রেরিত মিশন কথিত

অভিজাতদের শাসন-শোষণ-তুচ্ছতাচ্ছিল্যে ঘৃণাভরা, নির্যাতিত-অবহেলিত মানুষের মনোজয়ে সফল হয়। খোলাফায়ে রাশেদীনের সমাপ্তি এবং কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার পর স্বৈর রাজতন্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধ পরম বিবেকবান মনীষীরা ক্রমান্বয়ে নিজেদেরকে আরব রাজতন্ত্রের ছায়ামুক্ত করে মহানবী (দ.) প্রদর্শিত দাওয়াতী মিশন নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাধারণ মানুষের নিকট ছুটে যান। তাঁদের সুলিলিত কঢ়ে ছিল আল্লাহর প্রেমরাজ্যে সবাইকে সমর্পিত হবার দাওয়াত, আর বুকে ছিল মদিনা সনদ ভিত্তিক মানব সাম্য, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, বিচারসাম্য ও ন্যায়ের আন্তরিক এবং আক্ষরিক কর্মস্পূর্হ। এশিয়া-আফ্রিকা ব্যাপি ছড়িয়ে পড়া এই মানবিক মিশনের অভিযাত্রীরা ছিলেন সরল-সঠিক পথের অনুসারী আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর রাসূলের একান্ত প্রতিনিধি। মদিনা সনদ অনুযায়ী গঠিত মদিনা সাধারণতন্ত্রের সার্বিক পরিচালনা ব্যবস্থা ছিল তাঁদের আত্মস্থ। তাঁরা জানতেন আখেরী নবী হ্যরত মুহাম্মদ (দ.) পৃথিবীর সকল মানুষের জন্যে প্রেরিত নবী। এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনের ঘোষণা, “হে নবী! আমি ইচ্ছা করলে (আগের মতো) প্রতিটি সম্প্রদায়ের জন্যে আলাদা আলাদা সতর্ককারী প্রেরণ করতে পারতাম। কিন্তু আমি আপনাকে সর্বকালের সকল মানুষের জন্যে শেষ নবী হিসেবে প্রেরণ করেছি - (সূরা আল-ফুরকান : ২৫:৫১)। সুতরাং উপর্যুক্ত আয়াতের মর্মালোকে বিশ্বনবী (দ.)-এর মিশন পরিচালনা করতে হলে মদিনা সনদের মতো বিশাল চেতনা এবং কর্মধারা নিয়ে তাঁদের অন্তরও সুবিশাল করা বাস্তুনীয়। মদিনা রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যেমন ধর্ম-বর্ণ-কুলীন-অকুলীন নির্বিশেষে সকলের প্রতি আল্লাহর পালনবাদী নীতির অনুশীলন সফল এবং সার্থক প্রমাণিত হয়েছে, তেমনি এই মিশনের সদস্যরাও নিজেদের অন্তরকে সকল মানুষের ‘আবাসনযোগ্য’ করে বিশালত্ব নিয়ে মানুষের কাছে ছুটে গিয়েছেন। তাঁরা আক্ষরিক অর্থে তাঁদের খানকাহ এবং আন্তানা সমূহকে বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্যে উন্মুক্ত এবং অবারিত করে ইসলাম ধর্মের মৌলিক দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন। পৃথিবীর দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়া এই মিশন হলো কার্যকর অর্থে “তাসাওউফ মিশন”। মদিনা সনদের ভৌগোলিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার আলোকে উদ্ভাসিত তাসাওউফ সাধকদের অন্তর-ব্যবস্থার সুবিশাল পরিসরে তাই পৃথিবীর দেশে দেশে দেশে তাঁদের রওজা-মায়ার-দরগাহ-খানকাহ-আন্তানা সমূহে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের পারম্পরিক শ্রদ্ধায় সৌহার্দপূর্ণ, সমবেদনাভরা, মানব ভাতৃত্বমুখি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বিদ্যমান আছে।

মদিনায় হিয়রতের পর বিশ্বনবী (দ.) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অপশক্তির সশস্ত্র এবং কুটকৌশলগত বাধাবিঘ্নের সমুখীন হন। বদর, ওহুদ, খন্দক, মুতা, খায়বর, হনাইন প্রভৃতি সশস্ত্র যুদ্ধ আল্লাহর আদেশে জিহাদ নামে খ্যাত-তাতে বিশ্বনবী (দ.)

অংশগ্রহণ করে মানবাধিকার বিরোধী, মহান আল্লাহ'র একক এবং চিরস্তন আধিপত্যের প্রতিপক্ষ শক্তিকে পরাজিত এবং দমন করে তাওহীদের বাণী প্রচার করেছেন। জন্মভূমি মুক্ত ছেড়ে মদিনায় পৌঁছলে মদিনার বৃন্দ, পৌঁচ, যুবক-যুবতী, শিশু-কিশোর সমবেত হয়ে বিশ্বনবী (দ.)-কে অভিবাদন জানায়। শিশু-কিশোররা দফ বাজিয়ে গেয়ে উঠে “পূর্ণিমার চাঁদ আমাদের ওপর উদিত হয়েছে সানিয়াতুল বিদা থেকে, শুকরিয়া আদায় করা আমাদের উপর ওয়াজিব যে আহ্বানকারী আল্লাহ'র দিকে আহ্বান করে। হে মহান ব্যক্তি (নবী দ.) আপনি আমাদের কাছে আবির্ভূত হয়েছেন এবং এমন জিনিস নিয়ে এসেছেন যা অনুসরণযোগ্য।” এটি বিশ্বনবী'র (দ.) প্রতি মদিনাবাসীর অপরূপ কায়দায় স্থানিকতা অনুযায়ী অপূর্ব অভিবাদন। এ ধরনের অভিনন্দন জ্ঞাপন এবং আন্তরিকতার বিপরীতে মুক্তাবাসীর যেমন ছিল প্রকাশ্য শক্রতা-অন্যদিকে মদিনার বাসিন্দা ইহুদীবাদীদের ছিল গোপন শক্রতা, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও রাষ্ট্রদ্রোহীতা।

এছাড়া কিছু ব্যক্তি প্রকাশ্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে গোপনে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিভাতি ছড়িয়ে বিভক্তি সৃষ্টির ষড়যন্ত্রে নিমজ্জিত হয়। এরা মুনাফিক হিসেবে চিহ্নিত। মুসলমানদের মধ্যে বিভাতি ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে এরা মসজিদে নবী'র সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দিরা নামক স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করে বিশ্বনবী (দ.) কে নামায পড়ানোর জন্যে অনুরোধ জানায়। এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, “সত্য প্রত্যাখ্যান, বিশৃঙ্খলা ও বিশ্বাসীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মুনাফেকদের একটি অংশ একটি পৃথক মসজিদ নির্মাণ করেছে। ইতঃপূর্বে যারা আল্লাহ' ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, তারা তাদের গোপন ঘাঁটি হিসেবেও এ মসজিদকে ব্যবহার করতে চায়। (হে বিশ্ববাসীগণ! তোমরা) ওদের কাছে গেলে ওরা শপথ করে বলবে, আমরা নেক নিয়তে এ মসজিদ নির্মাণ করেছি।” আর এখন আল্লাহ' নিজে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, “ওরা মিথ্যাবাদী”। অতএব (হে নবী!) আপনি কখনো নামাযের জন্য সেখানে দাঁড়াবেন না। আল্লাহ' স্মরণের ভিত্তিতে যে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, নামাযের জন্যে সেটাই উপযুক্ত। আপনি শুধু সেখানেই নামাযের জন্যে দাঁড়াবেন। সেখানেই আপনি পরিশুদ্ধি-প্রয়াসী মানুষদের পাবেন। আর আল্লাহ' পরিশুদ্ধি-প্রয়াসী মানুষকে ভালোবাসেন” –(সূরা তওবা :৯: ১০৭-১০৮)। মদিনা শরিফে এ ধরনের নানামূর্খি মানুষের অবস্থানের মধ্যেই বিশ্বনবী (দ.) কে প্রতিরোধমূলক নানা কর্মসূচি গ্রহণ করতে হয়। এ ধরনের সার্বিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত অভিজ্ঞ সাহাবা কিরাম, তাবেঙ্গন, তাবে-তাবেঙ্গন এবং অধ্যাত্ম মনীষীরা তাওহীদের বাণী প্রচারের লক্ষ্যে পৃথিবীর দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁদের তাওহীদী অভিযাত্রা সর্বত্র সমানভাবে আদৃত হয়নি। মুক্ত থেকে মদিনায় হিয়রতের পর বিশ্বনবী (দ.) যে ধরনের

আতিথেয়তা পেয়েছিলেন তাসাওউফ অভিযাত্রীরা কোন কোন স্থানে সেভাবে বরিত হননি। বিশ্বনবী (দ.) মদিনায় একদিকে আনসারদের সমর্থনের ভিত্তিতে যেভাবে বহিঃশক্তি এবং অভ্যন্তরীণ মুনাফিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাওহীদের ঝাঙ্গা উত্তোলন করেছিলেন তাসাওউফ সাধকরা এ ধরনের বৈরী পরিবেশ মোকাবিলা করেছেন কখনো আল্লাহ'র হৃকুমে কারামত প্রদর্শন করে, কখনো প্রতাপশালী রাজশক্তিকে দমনের জন্যে সমকালীন মুসলিম বাদশাহদেরকে আক্রমণের আহ্বান জানিয়ে। ভারতে সুলতানুল হিন্দ হ্যরত খাজা মঙ্গলদীন চিশ্তি (ক.) বাংলার সিলেটে হ্যরত শাহজালাল ইয়েমেনী (রহ.) মুসিগঞ্জের বিক্রমপুর এলাকার রামপালের বাবা আদম শহীদ (রহ.), বগুড়ার শাহ সুলতান মাহী সওয়ার (রহ.), পাবনার শাহজাদপুরের মাকদুম শাহ দৌলাহ শহীদ (র.) বর্ধমানের মঙ্গল কোর্টের মাকদুম শাহ মোহাম্মদ গজনভী (রহ.) শেখ নূর কুতুব আলম (রহ.), শেখ বদর উল ইসলাম (রহ.), শেখ আনওয়ার (রহ.), শাহ মাকদুম রূপোস (রহ.) প্রমুখ তাওহীদের বাণীবাহক মহান আউলিয়াদেরকে তাওহীদ বিরোধী শক্তিশালী প্রতিপক্ষ রাজা, জমিদার এবং কথিত সম্ভাস্তদের বিরুদ্ধে লড়াই করে সত্যের পতাকা উড়োন করতে হয়েছে। সুলতানুল হিন্দ গরীবে নেওয়াজ হ্যরত খাজা মঙ্গলদীন চিশ্তি (র.) তাওহীদের বাণী প্রচার কল্পে আজমীরে পৌঁছলে তিনি চৌহান রাজবংশের উত্তরাধিকারী পৃথিরাজ কর্তৃক নানাভাবে নিগৃহীত এবং বাধাপ্রাপ্ত হন। খাজা মঙ্গলদীন চিশ্তি (ক.) তাৎক্ষণিক কোনরূপ উত্তেজনা প্রকাশ না করে রাজাকে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থানের আহ্বান জানান। কিন্তু পৃথিরাজ বার বার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রত্যাখ্যান করে খাজা বাবাকে আজমীর ত্যাগের নির্দেশ দিলে খাজা মঙ্গলদীন চিশ্তি (ক.) পৃথিরাজের পত্রবাহককে বলেন যে, “আমি পৃথিরাজকে জীবিত বন্দী করে শিহাবুদ্দিন ঘোরীর হাতে তুলে দিলাম।” অতঃপর পৃথিরাজ যুদ্ধে শিহাবুদ্দিন ঘোরীর নিকটে পরাজিত ও বন্দি হন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্যে মুসলিম বাহিনী প্রদত্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে তাকে হত্যা করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে খাজা মঙ্গলদীন চিশ্তি (ক.) প্রথমে শান্তভাবে বাধা বিপত্তি উত্তরণের চেষ্টা করেন। তা সম্ভব না হওয়ায় নিজে সশস্ত্র যুদ্ধে অবর্তীণ না হয়ে মুসলিম শাসকদের সামরিক অভিযাত্রীদের হাতেই সংকট নিষ্পত্তির দায়িত্ব অর্পণ করেন।

সিলেটের হ্যরত শাহ জালাল আউলিয়া সুদূর ইয়েমেন থেকে ইসলাম ধর্ম প্রচার এবং তাওহীদের পতাকা উড়োন করতে নমুনা স্বরূপ কিছু মাটি নিয়ে সিলেটে আসেন। সঙ্গে ছিলেন ৩৬০ আউলিয়া। তাওহীদ প্রচারের ক্ষেত্রে সিলেটের তৎকালীন সামন্ত রাজা গৌর গোবিন্দ কর্তৃক সশস্ত্র বাধার সম্মুখীন হন। এর পূর্বে দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ শাহ তুঘলক সিলেটের প্রজাপীড়ক, জালিম শাসক গৌর-গোবিন্দকে শায়েস্তা করার জন্যে সেনা অভিযান প্রেরণ করলেও তা সফল হয়নি। শেষে

সৈয়দ নাসির উদ্দিনকে সেনাপতি করে সিলেট অভিমুখে প্রেরণ করেন। সেখানে যাত্রাপথে সৈয়দ নাসির উদ্দিনের সঙ্গে হযরত শাহ জালাল আউলিয়ার সাক্ষাত ঘটে। এবার সিলেট অভিযানে হযরত শাহ জালালের নেতৃত্বে যুদ্ধ সংঘটিত হলে গৌর গোবিন্দ পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। দিল্লীর সুলতানের পক্ষ থেকে হযরত শাহজালাল (রহ.)-কে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের শাসক নিযুক্তির প্রস্তাব দেয়া হলে তিনি তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে উল্লেখ করেন যে, প্রজা শাসনের জন্যে নয় বরং তাওহীদের সামিয়ানা তলে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষকে সমবেত করার দায়িত্ব অর্পণ করে তাঁকে এখানে প্রেরণ করা হয়েছে। তাঁর কাজ দেশ জয় করা নয়, রাজ্য শাসনের লক্ষ্যে রাজমুকুট পরিধান করা নয়, তাঁর দায়িত্ব মানুষের অন্তর জয় করা।

দিনাজপুরের চিহ্নিগাজী (রহ.) হলেন কুতুবুল আকতাব হযরত কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী'র (রহ.) শিষ্য। তাওহীদের পতাকা উড়ীন এবং ইসলাম ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব নিয়ে তিনি দিনাজপুরে প্রেরিত হন। সেখানে তিনি লক্ষ্য করেন যে, হিন্দু সামন্ত রাজা শুধু তাওহীদ বিরোধী নন এবং ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে নির্মম স্বভাবের প্রজা উৎপীড়ক জালিম নৃপতিও বটে। সামন্ত রাজার অত্যাচার, অবিচার, নির্যাতনে অতিষ্ঠ ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ অসহায় এবং বিক্ষুন্ধ অবস্থায় কালাতিপাত করছে। অবশেষে উৎপীড়ক সামন্ত রাজার শাসন দণ্ড থেকে মুক্তির আশায় সকলে হযরত চিহ্নিগাজী'র (রহ.) শরণাপন্ন হলে সাধারণ মানুষের করণ আবেদনে তাদেরকে বাঁচানোর জন্যে রাজার বিরুদ্ধে চল্লিশজন সুফিসহ অন্তর্ভুক্ত ধারণ করেন। এতে রাজা পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। হযরত চিহ্নিগাজী সেখানে জনগণের মধ্যে ইসলাম ধর্মের অভেদ নীতি অনুশীলন করে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের পতাকা উড়ীন করেন।

আরবের মুক্তা নগরী থেকে প্রথম দিকে বাংলায় আগমনকারী সুফি-দরবেশদের অন্যতম হলেন মুসিগঞ্জের বিক্রমপুরের রামপালে সমাহিত বাবা আদম শহীদ (রহ.)। রামপাল তখন সামন্ত রাজা বল্লাল সেনের রাজধানী ‘বল্লাল বাড়ি’ হিসেবে পরিচিত ছিল। রামপালের অদূরে বসবাসকারী এক মুসলিম পরিবার স্বীয় সন্তানের আকিকা সম্পাদনের নিমিত্তে গরু কোরবানী দিলে রাজা বল্লাল সেন কর্তৃক চরম নির্যাতনের শিকার হয়ে এলাকা ত্যাগে বাধ্য হন। বল্লাল সেন ছিলেন খুবই অত্যাচারী, ভিন্ন ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণু, প্রজা নির্যাতক, আর্যবাদী হওয়ায় শ্রেণি ভেদ, বর্ণ ভেদ লালনকারী হওয়ার কারণে স্বধর্মীয় প্রজারাও তাঁর প্রতি বিক্ষুন্ধ ছিলেন। বল্লাল সেনের উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে ঐ মুসলিম ব্যক্তি এক পর্যায়ে মুক্তা গমন করে তাঁর অভিযোগ কাবা শরিফে অবস্থানরত ফকির বাবা আদম শহীদকে অবহিত করেন। বাবা আদম শহীদ সমন্ত ঘটনা শুনে বিষয়টিকে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা হিসেবে চিহ্নিত করে

মুক্তা থেকে ছয়-সাত হাজার ফকির দরবেশ সহযোগে মুসিগঞ্জের রামপালে চলে আসেন। গরু কোরবানীর কারণে ভিন্ন ধর্মের প্রজাদের বিতাড়িত করায় বাবা আদম শহীদ উক্ত স্থানে অসংখ্য গরু কোরবানী দিয়ে মেজবানের আয়োজন করেন। এই ঘটনায় সামন্ত রাজা বল্লাল সেন অগ্নি শর্মা হয়ে আদম শহীদের ফকির বাহিনীকে আক্রমণ করেন। এই স্থানে সংঘটিত যুদ্ধে ফকির নেতা বাবা আদম শহীদ হন। অবশ্য ঘটনার পর পর বল্লাল সেন সপরিবারে অগ্নিকুণ্ডে আত্মহত্যা দেন। রামপালের উক্ত স্থানে বাবা আদম শহীদের মাজার রয়েছে।

পাবনার শাহজাদপুরে তাওহীদের পতাকা উত্তোলন করতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন হযরত মখদুম শাহ দৌলাহ শহীদ। মঙ্গল কোটে মখদুম শাহ মাহমুদ গজনভী তাওহীদের বাণী প্রচার করতে এসে সেখানকার সামন্ত রাজা বিক্রম কেশরী কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হন। রাজা বিক্রম কেশরী তাঁর রাজধানী উজ্জয়নীতে অবস্থান করে শাহ মাহমুদ গজনভীকে হত্যার জন্যে নানামুখি ষড়যন্ত্রে লিঙ্গ হয়ে বার বার ব্যর্থ হন। তবে দিল্লী থেকে ভারত সুলতানের ফার্সি ভাষায় লিখে পাঠানো এক চিঠি পাঠ করতে অক্ষম হয়ে এর মর্মার্থ জ্ঞাতার্থে রাজা বিক্রম কেশরী এক বাহক মারফত চিঠিটি ফকির শাহ মাহমুদ গজনভীর নিকট প্রেরণ করেন। ফকির সাহেব চিঠি পাঠান্তে উক্ত লিখে মঙ্গলকোটে ধর্ম প্রচারে রাজার বাধা প্রদান এবং ধর্ম বিষয়ে চরম অসহিষ্ণুতা সম্পর্কে সুলতানকে অবহিত করেন। পত্র পাঠান্তে সুলতান মঙ্গলকোটের রাজা বিক্রম কেশরীকে শাস্তি প্রদানের জন্যে সতেরজন দরবেশের নেতৃত্বে বিশাল সামরিক বাহিনী হযরত মখদুম শাহ মাহমুদ গজনভী সমীক্ষে প্রেরণ করেন। মঙ্গলকোটের যুদ্ধে রাজা পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। এখানে শাহ মাহমুদ গজনভী এবং সতেরজন দরবেশের দরগাহ রয়েছে।

নেত্রকোনার হযরত শাহ সুলতান কমরুন্দীন রূমী (রহ.) তাওহীদের বাণী প্রচারের এক পর্যায়ে বগুড়ার তৎকালীন রাজা পরশুরাম কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হন। এক পর্যায়ে যুদ্ধ বিগ্রহ শুরু হলে রাজা পরশুরাম পরাজিত ও নিহত হন। তখন পরশুরামের একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিলেন স্বীয় ভগ্নি পরমা সুন্দরী শিলাদেবী। ভ্রাতৃ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে অন্তর্ভুক্ত শিলাদেবী যুবক শাহ সুলতান রূমীর (রহ.) মুখোমুখি হয়ে শাহ সুলতানের নুরানী চেহারা এবং আভিজাত্যের পরশ মাথা সৌম্য, সুন্দর, আকর্ষণীয় দেহাবয়ব লক্ষ্য করে বিমোহিত হয়ে রাজ সিংহাসনসহ সব কিছুর বিনিময়ে মহান সুফি শাহ সুলতানের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হবার প্রস্তাব প্রেরণ করেন। কিন্তু কঠোর আত্মসংযোগ এই সাধক এ ধরনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এতে শিলা দেবী অপমানিত হয়ে আত্মহত্যা করেন। ইসলাম ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে এটি রাসূল (দ.) নির্দেশিত একটি পছ্টা যা জিহাদের আদর্শের অনুশীলনে

সংঘটিত হয়েছে। বগুড়ায় তাওহীদের নিশান উত্তোলন করে হযরত শাহ সুলতান রূমী (রহ.) অতঃপর নেতৃত্বায় গমন করেন। তখন সেখানে কোচরাজ মদনের শাসনাধিপত্য চলছিল। দুপুর গড়িয়ে বিকেল সময়ে কোচরাজার দরবারে চল্লিশ জন দরবেশসহ বিদেশী ফকির শাহ সুলতান রূমীর উপস্থিতি লক্ষ্য করে রাজা মদন এবং তাঁর পরিষদবর্গ তুচ্ছ তাচিল্যভাবে ফকিরের আগমনের কারণ জানতে চান। হযরত শাহ সুলতান রূমী (রহ.) কোচরাজা মদন এবং পরিষদবর্গকে তাওহীদে আনুগত্য প্রকাশ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান এবং আসরের নামায আদায়ের অনুমতি চান। এতে রাজার পরিষদবর্গ ক্ষিণ্ঠ হলেও রাজা মদন শান্তভাবে শাহ সুলতানের আধ্যাত্মিক শক্তি পরীক্ষার জন্যে কৌশল অবলম্বন করেন। রাজা তখন শাহ সুলতানকে জানান যে, প্রথা অনুযায়ী রাজদরবারে আগত অতিথিকে শরবত পান করিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয়। রাজা হযরত শাহ সুলতান রূমী (রহ.)-এর আধ্যাত্মিক শক্তি পরীক্ষার জন্যে শরবতের সঙ্গে ‘হলাহল’ বিষ মিশিয়ে তা পান করার আহ্বান জানান এবং বলেন যে, এরপর নামায আদায়ের জন্যে জায়গা দেয়া হবে। হযরত শাহ সুলতান ‘বিসমিল্লাহ’ বলে পাত্রস্থিত বিষ মিশিত শরবতের অর্ধেক পান করে বাকিটুকু অন্য চল্লিশজন দরবেশকে পান করতে দেন। হলাহল বিষের ক্রিয়া এতো তীব্র যে একফোটা পান করলে মুহূর্তের মধ্যেই মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু রাজা মদন লক্ষ্য করলেন যে, শাহ সুলতান সহ দরবেশবৃন্দ স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছেন এবং অঙ্গীকার অনুযায়ী জায়নামায বিছানোর জন্যে জায়গা চাচ্ছেন। অবশ্যে অঙ্গীকার অনুযায়ী রাজা শাহ সাহেবকে রাজদরবার কক্ষে জায়নামায বিছানোর অনুমতি দেন। দেখা গেল জায়নামায যখন বিছানো হলো তখন তা স্বেচ্ছায় প্রসারিত হতে হতে রাজ দরবারে ছড়িয়ে পড়ে। অবস্থা দেখে রাজা মদন পরিবার এবং পরিষদসহ দরবারের বাইরে চলে যান। নামাযান্তে হযরত শাহ সুলতান রূমী (রহ.) ইসলাম প্রচারে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করেন। এ ধরনের অলৌকিক কাজ পর্যবেক্ষণ করে রাজা মদন সপরিবারে এলাকা পরিত্যাগ করেন। কোচরাজা মদন স্বীয় এলাকা ত্যাগের পূর্বে শাহ সুলতান রূমীকে ৫০ মন স্বর্ণ দিতে চাইলে দরবেশ তা প্রত্যাখ্যান করেন। রাজা অনুত্ত হয়ে স্বর্ণগুলো পুরুরে ফেলে দেন এবং দরবেশ সমীপে পুরুরের নাম মদন পুরুর রাখার অনুরোধ জানান। সুলতান রূমী (রহ.) রাজা মদনের অনুরোধ রক্ষা করে এলাকার নাম দেন মদনপুর এবং পুরুরের নাম রাখেন মদন পুরুর। উল্লেখ্য যে, প্রথ্যাত তাসাওউফ ব্যক্তিত্ব হযরত শাহ সুলতান রূমী (রহ.) তাওহীদ এবং ইসলাম ধর্ম প্রচারকালে বগুড়া এবং নেতৃত্বায় যে ধারার অনুশীলন করেন তা বিশ্বনবী (দ.) প্রদর্শিত ধারারই প্রতিফলন মাত্র।

বগুড়ার শাহ সুলতান মাহী সওয়ার (রহ.), রাজশাহীর শাহ মখদুম রূপোস (রহ.) সহ অসংখ্য আউলিয়া তাওহীদের বাণী নিয়ে ভারত-বাংলাসহ এশিয়া আফ্রিকার বিভিন্ন এলাকায়

ছড়িয়ে পড়েন। এদের অনেকে ধর্ম প্রচারে বাধা বিপত্তির মুখে পতিত হয়ে প্রতিপক্ষের তীব্র আক্রমণের মুখে যুদ্ধে লিপ্ত হতে বাধ্য হন। তাওহীদের পতাকা উর্ধ্বে উত্তোলন করতে গিয়ে কেউ কেউ শহীদ হন। আবার অনেকে রাজার বৈরীতা সত্ত্বেও স্থানীয় জনগণের পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা নিয়ে রাজাকে প্রতিহত করে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন।

মুসলিম তাসাওউফ সাধকদের বিশাল মিশন পৃথিবীব্যাপি ছড়িয়ে পড়ার পর দেখা গেছে কোথাও প্রতিবন্ধকতা অপসারণকল্পে জিহাদে লিপ্ত হতে হয়েছে, আবার কোথাও কোথাও স্থানীয় রাজা এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সাধকদের চারিত্রিক মাধুর্য এবং কারামত পর্যবেক্ষণ করে স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হয়ে তাওহীদের সামিয়ানার নীচে সামিল হয়েছেন। বাংলাদেশের নেতৃত্বায় মদনপুরের হযরত শাহ সুলতান রূমী (রহ.), শায়খ শরফ উদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরী (রহ.) রাজশাহীর বগা উপজেলার মাওলানা শাহ দৌলাহ, সিলেটের হযরত শাহ পরান (রহ.) সহ অনেক আউলিয়া স্থানীয় সামন্ত রাজা, জমিদার এবং ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদেরকে তাওহীদের অমৃত বাণী এবং কোন কোন সময় কারামত প্রদর্শন করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে প্রগোদ্ধিত করে সফল হন। অর্থাৎ খোলাফায়ে রাশেদীনের পর ইসলাম ধর্ম প্রচারকল্পে তাসাওউফ সাধকরা স্থানীয় রাজা এবং প্রভাবশালীদের আচরণের আলোকে জনগণের মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে কোথাও অন্তর্ধারণ করে জিহাদের আয়োজন করতে বাধ্য হয়েছেন, আবার কোথাও কোথাও কোন প্রকার বাধা বিষ্ণ ব্যতিরেকে অত্যন্ত শান্ত পরিবেশে তাওহীদ প্রচারে সহযোগিতা পেয়ে সফল হয়েছেন। এ কথাও সঠিক যে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে বাধা প্রাপ্ত না হলে তাঁরা কখনো সংঘর্ষে লিপ্ত হন নি। তাঁরা ধর্ম প্রচার করেছেন, ধর্মগ্রহণ করার জন্যে বিন্যোগ ভাষায় স্থানীয় শাসকসহ জনগণের নিকট আবেদন রেখেছেন, কিন্তু কারো উপর ধর্ম চাপিয়ে দেননি, বা কাকেও ধর্মগ্রহণে বাধ্য করেন নি। ইসলাম ধর্ম প্রচার ক্ষেত্রে তাঁরা বিশ্বনবী (দ.)-এর অনুসূত নীতিকে অবস্থা ভেদে গণমুখি ধারায় বিভিন্নভাবে অনুশীলনে এনেছেন মাত্র।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে খোলাফায়ে রাশেদীন পরবর্তী তাসাওউফ সাধনায় উত্তীর্ণ সাহাবা কিরাম, তাবেয়ীন, তাবে তাবেঙ্গীন এবং আধ্যাত্মিক সাধকরা কখনো রাজতন্ত্রকে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার উপাদান হিসেবে মেনে নেন নি। তাই তাঁরা স্বেচ্ছায় রাজদরবার থেকে দূরে থেকেছেন। কখনো কোন রাজা, বাদশাহ, সুলতান, সম্রাট, শাসক, আমীর, উমরাহ উপদেশের প্রত্যাশী হলে তাঁদের অনেকে রাজা-বাদশাহকে সরাসরি সাক্ষাত না দিয়ে প্রয়োজনীয় নৈতিক নির্দেশ-উপদেশ প্রদান করতেন। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, দেশের পর দেশ জয় করেও সম্রাট সুলতানদের দেশ বিজয়ের লোভ সংযম হয় না। সম্রাট-সুলতানদের অত্পুর্ণ মন, লোভ-লোলুপতার কারণে

লালঘোড়া দাবড়িয়ে অগণিত নিরীহ মানুষের জান-মাল-ঘর বাড়ি ইজত, আক্রম ধ্বংস করার কারণে সহস্র কোটি “হন্দয় কাবা” ধ্বংস এবং নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। নদীর জল প্রবাহের চেয়েও অফুরান বেগবান রক্তস্তোত সৃষ্টি করে তারা উল্লাস উন্নাদনায় মেতে উঠে। এ ধরনের হিংস্তার সতীর্থ হতে কখনো তাসাওউফ সাধকরা সম্মত নন। কারণ এ ধরনের হিংস্তা-বর্বরতায় আল্লাহর অনুমোদন নেই। বরং তারা তাওহীদ প্রচারের স্বার্থে মানুষের দিল জয় করে হাজার বার কাবা জিয়ারতের পুণ্যতা অর্জনে থাকেন বন্ধপরিকর। তাই খোলাফায়ে রাশেদীনের পর তাসাওউফ সাধকরা সক্রিয় রাজনৈতিক তৎপরতা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখেন। তারা নৈতিক শিক্ষকের দায়িত্ব পালনকেই নিজেদের মৌলিক কর্ম হিসেবে বেছে নেন। নিজেদের বিবেক এবং অন্তরে মদিনা সনদ এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থার দীপশিখা উজালা করে তারা তাঁদের হন্দয়কে পরিণত করেন ঐশ্বী প্রেমের জলসা ঘরে। মদিনা সনদ অনুযায়ী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ধর্ম বর্ণ গোত্রের তারতম্য পরিহার করে সত্য এবং ন্যায়ের মানদণ্ডে যেভাবে সকলকে আবাসিত করা হয় তেমনি তাসাওউফ সাধকরা নিজেদের হন্দয়কে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের আবাসনযোগ্য করে তুলেন। অর্থাৎ প্রত্যেক মহৎ প্রাণ তাসাওউফ সাধকের অন্তর এবং খানকাহ মদিনা সনদ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে নির্ধারিত অবহেলিত মানুষের চোখে পরিদৃষ্ট হয়েছে। এ জন্যে দেখা যায় গাউসুল আয়ম হ্যারত সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানীর (ক.) রওজায় ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলে সমবেত হবার সুযোগপ্রাপ্ত হন। বিপদে আপত্তি হলে প্রথ্যাত সাহাবা হ্যারত আইউব আনসারীর (রা.) মাজারে এখনো বোমানরা বিপদ মুক্তির জন্যে বিন্দু ভাষায় ফরিয়াদ পেশ করে থাকেন। কারবালার হন্দয় বিদারক ঘটনার পর ইহুদী খ্রিস্টানরাও বেদনার্ত হয়ে নির্মতার নিন্দা জানিয়েছে। ভারতবর্ষে সুলতানুল হিন্দ গরীবে নেওয়াজ হ্যারত খাজা মঙ্গলুদ্দীন চিশ্তি'র (ক.) মাজারে মুসলিম, হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, অগ্নি উপাসক সকলেই অত্যন্ত বিনীতভাবে উপস্থিত হয়ে স্ব স্ব ফরিয়াদ পেশ করে থাকেন। হ্যারত শেখ আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী (রহ.) দরগাহতে মুসলমান জিয়ারতকারীদের পাশাপাশি শিখদেরও অবারিত অবস্থান দেখা যায়। হ্যারত মাওলানা জালালুদ্দীন রূমীর (রহ.) জানায় মিছিলে হাজার হাজার শোকাহত মুসলিমের কলেমা উচ্চারণের পাশাপাশি খ্রিস্টান-ইহুদী শোকার্তদেরকে স্বীয় ধর্মগ্রহ থেকে স্তোত্র পাঠ করে সামিল হবার ঘটনা ইতিহাসে বর্ণিত আছে। হ্যারত নিয়ামুদ্দিন আউলিয়ার (ক.) জানায় মিছিলে মুসলমান-হিন্দু শিখরা ব্যাপকভাবে সমবেত হয়ে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন। ঢাকার চকাবাজার মসজিদে শায়িত মুজাদ্দিদীয়া তুরিকার অন্যতম ইমাম হ্যারত হাফেজ আহমদ জৈনপুরীর জানায় মিছিলে ঢাকার শাখারী বাজারের শোকার্ত হিন্দু নর-নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণের তথ্য এখনো ঢাকাবাসীর নিকট শোনা যায়। দিনাজপুরের গোড়া পীরের

নিকট হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ সকলে সমভাবে সমাদৃত হতেন। তাই এখনো বিয়ের পূর্বে হিন্দু-বর কনে তাঁর মাজারে গমন করে দোয়া প্রার্থনা করে থাকেন। প্রতি শুক্রবার হিন্দু সম্প্রদায় সেখানে কীর্তন করে। প্রতি বছর ১২ ফালুন গোয়ালারা বার মণ দুধ দিয়ে মাজার ধূয়ে নেয় এবং আরতি করে থাকে। চট্টগ্রামের হ্যারত মোহসেন আউলিয়ার দরগায় ছনের ছাউনি স্থানীয় যোগী সম্প্রদায় সম্পন্ন করে থাকে। গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর দরবার ধর্ম-বর্ণ দীন-ইন মোতাকি পাপী-তাপী সকলের জন্যে অবারিত মিলনের এক বিশাল সাম্রাজ্য। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে তাসাওউফ সাধকরা নিজেদের অন্তরকে হককুল্লাহ তথা আল্লাহ প্রেম এবং হকুল ইবাদ তথা মানব প্রেমের এমন এক মহান মন্ডিলে পরিণত করেছেন যেখানে সকল মানুষ নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম এবং নিশ্চিত নিরাপত্তা ও নিরাপদে আবাসিত হবার বিষয়ে আস্থাবান থাকে। তাসাওউফ সাধকরা আধ্যাত্মিকতার পাশাপাশি সামাজিক এই মহান মানবিক ধারাটিও বিশ্বনবী (দ.) প্রণীত এবং প্রবর্তিত মদিনা সনদ থেকে অর্জন করেছেন। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা মহান রব আল্লাহ পৃথিবীর সমগ্র এলাকাকে সালাত আদায়ের লক্ষ্যে বিশ্বনবী (দ.)-এর জন্যে পবিত্র করে দিয়েছেন- যা এর পূর্বে কোন নবীর জন্যে ঘোষণা করা হয়নি। অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীকে আল্লাহ বিশ্বনবী (দ.)-এর জন্যে মসজিদের মতো পবিত্রতা প্রদান করেছেন। মসজিদে যেমন মানুষকে সবসময় পবিত্রতাসহকারে কল্যাণের অভিসারে অবস্থান করতে হয়, তেমনি আল্লাহর খলিফা হিসেবে মানুষ পৃথিবীর সকল স্থানে পবিত্রতা সহকারে স্থানকলে সদা সতর্ক এবং সচেষ্ট থাকাই বান্দার প্রতি আল্লাহর অভিলাষ। সাধারণভাবে দেখা যায় সুনির্দিষ্ট ইবাদত গৃহে সকল মানুষের অবাধ প্রবেশাধিকার নেই। ধর্মীয় আচারবাদিতায় এতে বিধি নিষেধ রয়েছে। ওয়াজ, মিলাদ এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের কীর্তন, যোগসাধন, প্রার্থনা সভায় স্ব স্ব ধর্মাবলম্বী ব্যতীত অবারিতভাবে সকলের উপস্থিত হবার মতো সুযোগ ও পরিবেশ থাকেন। অর্থে বিশ্বনবীর মর্যাদায় অভিষিক্ত হ্যারত মুহাম্মদ (দ.)-এর প্রতি সম্মানার্থে আল্লাহ সমগ্র পৃথিবীকে আল্লাহর ইবাদতগাহের মর্তবা প্রদান করেছেন। অর্থাৎ পৃথিবী সকল মানুষের কল্যাণ কর্মের জন্যে উন্নুক্ত এবং অবারিত। তাসাওউফ সাধকরা নিজেদের খানকাহ, মাজার এবং সাধনাস্থলকে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্যে পবিত্রতার শর্তে উন্নুক্ত রেখে বিশ্বনবী (দ.)-এর প্রতি প্রদত্ত মর্যাদাগত নির্দেশনার ধারাকে উজ্জীবিত রেখে চলেছেন। তাসাওউফ সাধনা ধারায় এখনো বিশ্বনবী (দ.)-এর প্রদর্শিত পথই মুসলিম সুফি, দরবেশ, পীর, বুর্জুর্গা অনুশীলন করে বক্তি এবং সমাজ পরিশুদ্ধিতায় ভূমিকা রেখে চলেছেন। (চলবে)

উম্মুল মু'মিনীন হ্যরত উম্মে সালমা বিনতে আবু উমাইয়া (রা.)

● মো. গোলাম রসুল ●

“নবী করিম (দ.) মু'মিনদের কাছে তাদের নিজের চেয়ে ঘনিষ্ঠিতর এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা”- (সূরা আহ্যাব : ৬) বিশ্বনবী হ্যরত মুহাম্মদ (দ.)-এর পবিত্র সহধর্মীগণ উপর্যুক্ত আয়াত অনুযায়ী পরম সম্মানিত এবং সুউচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত হিসেবে ‘উম্মাহাতুল মু'মিনীন’ পদ সোপানে সম্মৌধিত। পবিত্র কোরআনের ঘোষণা অনুযায়ী তাঁরা, ‘অন্য নারীদের মতো নন’ নবী (দ.) এর বেছালের পর তাঁদেরকে বিবাহ করা ‘কখনো বৈধ নয়’। ‘আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা বড়ই অপরাধ।’ উপর্যুক্ত সম্মান এবং অতীব মর্যাদাবানদের একজন হলেন উম্মুল মু'মিনীন হ্যরত উম্মে সালমা (রা.)। উম্মাহাতুল মু'মিনীনের ক্রমধারা অনুযায়ী তাঁর অবস্থান ষষ্ঠ।

বৎশ পরিচয় : হ্যরত উম্মে সালমা (রা.)-এর আসল নাম হলো হিন্দ। কুনিয়ত উম্মে সালমাহ (রা.)। তিনি কোরেশের মাখজুম বংশোদ্ধৃত ছিলেন। তাঁর নসবনামা হলো : হিন্দ বিনতে আবি উমাইয়া বিন মুগিরাহ বিন আবদুল্লাহ বিন ওমর বিন মাখজুম। মাতার নাম ছিল আতিকা বিনতে আমের। তিনি ফিরাস বংশের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। হ্যরত উম্মে সালমা (রা.)-এর পিতা আবু উমাইয়া একজন সম্পদশালী ও দানবীর ছিলেন। তাঁর বদান্যতা এবং দানশীলতার কথা খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। বিশ জন মানুষ তাঁর দন্তরখানে পালিত হতো। কোন সময়ে সফরে গেলে সকলের খাদ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব তাঁর উপরেই ন্যস্ত থাকতো। এসব উদারতার জন্য তিনি ‘যাদুর রাকিব’ অর্থাৎ সফরকারীদের সম্পদ উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। সমগ্র কোরেশ গোত্রের মধ্যে তাঁকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখা হতো।

প্রথম বিবাহ : হ্যরত উম্মে সালমা (রা.)-এর প্রথম বিয়ে হয়েছিল চাচাতো ভাইয়ের সাথে, তাঁর নাম ছিল আবু সালামা বিন আব্দুল আসাদ (রা.)। তিনি অত্যন্ত ভদ্র প্রকৃতির যুবক ছিলেন। রাসূলে করিম (দ.) যখন দ্বীনের দাওয়াতের কাজ শুরু করলেন, তখন তাঁর মতো পবিত্র স্বভাবের মানুষের পক্ষে এ দাওয়াতে প্রভাবিত না হওয়াটা অস্বাভাবিক ছিলো। তিনি নিজের গোত্রের বিরোধিতা ও অন্যান্য বিপদ মাথায় নিয়ে কালবিলম্ব না করে ইসলাম গ্রহণ করেন। হ্যরত উম্মে সালমা (রা.) সেই সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। এভাবে এ দম্পতি মহান মর্যাদার অধিকারী হয়ে “আস-সাবিকুনাল আওয়ালুন” হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। এ সকল পবিত্র আত্মার মানুষ ইসলামের জন্য সীমাহীন দুঃখ কষ্ট ও বিপদাপদ সহ্য করলেও সত্য পথ থেকে বিন্দু মাত্রও বিচ্যুত হননি। মুসলমানদের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পেতে লাগলো কাফেররাও নির্যাতনের মাত্রা

বাড়িয়ে দিতে লাগলো। তাদের নির্যাতন যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন রাসূলে করিম (দ.) সাহাবায়ে কেরামকে হাব্শায় হ্যরত করার অনুমতি দিলেন। নবী করিম (দ.) বললেন, যারা নিজের দ্বীন ও জীবন বাঁচাতে চায় তারা যেন হাব্শা চলে যায়। সেখানে একজন নেককার খ্রিস্টান বাদশাহুর শাসন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

উম্মে সালমা (রা.) এবং তাঁর স্বামী আবু সালামা বিন আব্দুল আসাদ যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন তাঁদের উপর চরম অত্যাচার শুরু হলো। কিন্তু তাঁরা বিন্দুমাত্র দুর্বল হলেন না, বরং ঈমানের উপর অবিচল থাকলেন। অত্যাচারের মাত্রা যখন কঠিনতম হলো, তখন তারা উভয়ই রাসূল (দ.)-এর অনুমতিক্রমে হাব্শায় হ্যরত করলেন। মুক্তায় তাঁদের বিলাস বহুল বাড়ি, উচ্চ মর্যাদা আর বংশের গৌরবগাঁথা সবকিছুর মায়া ত্যাগ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য অচিন প্রবাসে পাড়ি জমালেন। হাব্শার বাদশাহ নাজাশীর সার্বিক সহযোগিতা পাওয়া সত্ত্বেও ‘ওহীর’ অবতরণ ক্ষেত্রে এবং হিদায়াতের উৎস মুক্তায় প্রতি তাঁদের আকর্ষণ বেড়েই চললো। এমন সময় হ্যরত হাময়া ইবনে আব্দুল মুক্তালিব এবং উমর ইবনুল খাত্বাবের ইসলাম গ্রহণের খবর প্রচারিত হয়েছিল। তখন মুসলিমরা শক্তিশালী হয়েছেন বলে সংবাদ পাওয়া গেল। এমতাবস্থায় তাঁরা স্বামী-স্ত্রী মিলে মুক্তায় প্রত্যাগমনকারীদের মধ্যে অগ্রগামী হলেন। মুক্তায় আসার পর দেখলেন কোরেশদের অত্যাচার আরও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাঁদের উপরও বিড়ব্বনা ও কষ্ট ভয়াবহ আকার ধারণ করলো। এমনই পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ (দ.) সাহাবীদের মদিনায় হ্যরতের অনুমতি দিলেন। উম্মে সালমা ও তাঁর স্বামী মদিনায় হ্যরত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তখন হ্যরত আবু সালামা (রা.)-এর কাছে শুধু একটি উট ছিলো। তার উপর তিনি হ্যরত উম্মে সালমা (রা.) এবং শিশু সন্তান সালামকে আরোহন করালেন ও নিজে উটের রশি ধরে পায়ে হেঁটে রওয়ানা দিলেন। কিছু দূর যেতে না যেতেই উম্মে সালমা (রা.)-এর বংশের লোকেরা অর্থাৎ বনু মুগিরাহর লোকজন এ কথা জানতে পারলো। তারা এসে উটকে ধিরে দাঁড়ালো এবং আবু সালামা (রা.) কে বললো, “তুমি যেতে পার। কিন্তু আমাদের মেয়েকে তোমার সাথে যেতে দিব না।” এ কথা বলে তারা আবু সালামা (রা.) এর হাত থেকে উটের রশি কেড়ে নিলো এবং উম্মে সালমা (রা.) কে জোরপূর্বক নিজেদের সাথে নিয়ে চললো। ইত্যবসরে আবু সালমা (রা.) এর বংশের লোকেরা এসে পৌঁছালো। তারা উম্মে সালমা (রা.) এর শিশু সন্তান সালমাকে হস্তগত

করলো এবং বনু মুগিরাহকে বললো, “তোমরা যদি নিজেদের মেয়েকে আবু সালামা (রা.) এর সাথে যেতে না দাও তাহলে আমরা আমাদের গোত্রের শিশু সন্তানকে তোমাদের কাছে দেব না।” তারা উম্মে সালমা (রা.) কে বললো, “একাকী তোমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যাও।”

মাত্র অল্প সময়ের ব্যবধানে উম্মে সালমা (রা.)-এর সাজানো বাগান ও সংসার তচ্ছন্দ হয়ে গেল। তিনি হলেন স্বামী ও সন্তানের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন। অবশ্য তাঁর স্বামী জান মান ও ঈমান বাঁচাতে মদিনায় চলে গেলেন। সেদিন থেকে প্রতিদিন সকালে তিনি বালু উপত্যকায় যেতেন এবং সেখানে বসে বসে বিলাপ ও ক্রন্দন করতেন। রাতের অন্ধকার নেমে আসলে তিনি ফিরে আসতেন। এভাবে প্রায় এক বছর কেটে গেল। হঠাৎ একদিন তাঁর শ্বশুর গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁর দুরবস্থা দেখে কোমল-হৃদয় হলেন এবং গোত্রের অন্যান্যদের বিশেষ আবেগ ও করণ জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করলেন। তাঁর নিজের গোত্রের লোকেরা তাঁর স্বামীর কাছে চলে যাওয়ার অনুমতি দিল। কিন্তু সন্তানকে ছেড়ে তিনি কিছুতেই যেতে রাজি হলেন না। তখন তাঁর মর্মবেদনা শ্বশুর গোত্রের নিকট পৌঁছালো এবং তাদের অন্তর কোমল হলো। তারা উম্মে সালমা (রা.) এর সন্তানকে ফেরত দিলেন। এ সময় তাঁর সন্তানকে সাথে নিয়ে মুক্ত ত্যাগের উদ্দেশ্যে এবং স্বামীর সঙ্গে মদীনায় দেখা করার জন্য একটি উটের ব্যবস্থা করলেন। তাঁর সঙ্গে ঐ সময় আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো সঙ্গী ছিল না। তবুও তিনি তাঁর সন্তানসহ স্বামীর উদ্দেশ্যে মদীনার পথে যাত্রা করলেন মুক্ত থেকে তিনি মাইল দূরে ‘তানঙ্গে’ পৌঁছার পর উসমান ইবনে তালহার সঙ্গে দেখা হলো, তালহা তখনও মুসলমান হন নাই। তবুও এ মুশরিক তালহা বললেন, “হে ‘যাদুর রাকিব’ (মুসাফিরের পাথেয়)-এর কন্যা, তোমাকে একাকী যেতে দেওয়া সম্ভব নয়; মদীনায় পৌঁছা পর্যন্ত আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।” যাত্রা বিরতির সময় তালহা উটকে বসাতেন এবং নিজে একটু দূরে থাকতেন। আবার যাত্রা শুরু হলে তিনি উটের লাগাম ধরে পথ চলতেন। মদীনা থেকে দুই মাইল দূরে ‘কুবা’-র নিকটবর্তী বনু আমর ইবনে আউফেল বস্তিতে পৌঁছার পর তালহা বললেন, “তোমার স্বামী আছেন এ গ্রামেই। তুমি আল্লাহ্ নামে চলে যাও।” তিনি সেখান থেকেই মুক্ত উদ্দেশ্যে ফেরত যাত্রা করলেন। দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্নতার পর আবার এলো পরম কাঙ্ক্ষিত মিলনের ক্ষণ। উম্মে সালমার চক্ষু শীতল হলো স্বামীকে দেখে। আবু সালামাও স্ত্রী সন্তানকে দেখে খুশি হলেন।

জিহাদে আবু সালামা : উম্মুল মু'মিনীন হ্যরত উম্মে সালমা বিনতে আবু উমাইয়া (রা.)-এর প্রথম স্বামী হ্যরত আবু সালাম (রা.) বদর এবং ওহুদ যুদ্ধে শরিক হয়েছিলেন। ওহুদ যুদ্ধে তিনি বাহুতে মারাত্মকভাবে আহত হন। একমাস চিকিৎসার পর সুস্থ হন। হিজরী ৪৮ সনে বিশ্বনবী (দ.) তাঁকে

আমীর করে মুহাররামে একটি অভিযানে প্রেরণ করেন। ২৯দিন পর সেখান থেকে ফিরে আসেন। তখন তাঁর বাহুর ক্ষতস্থানে পুনরায় রক্তক্ষরণ শুরু হয়। রক্তক্ষরণের কারণে হিজরী ৪৮ সালের ৮ জমাদিউস সানীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

হ্যরত নবী করিম (দ.) যখন আবু সালামা (রা.) এর ইন্তিকালের খবর শুনতে পেলেন তখন তিনি তাঁর বাড়ি গেলেন এবং উম্মে সালমা (রা.)কে সবর করতে বললেন এবং বললেন, “আবু সালামার মাগফিরাতের জন্য দোয়া কর।” ইন্তিকালের সময় হ্যরত আবু সালমা (রা.) এর চোখ খোলা অবস্থায় ছিল। নবী করিম (দ.) নিজের পবিত্র হাত দিয়ে সে চোখ বন্ধ করলেন। তাঁর জানায় পড়ানোর সময় নবী করিম (দ.) নয় তাক্বীর বললেন। লোকজন জিজেস করলো, “ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি নয় তাক্বীর কেন বললেন?” তিনি বললেন, “আবু সালামা হাজার তাক্বীরের যোগ্য।”

হ্যরত আবু সালমা (রা.) সম্পর্কে হ্যরত উম্মে সালমা (রা.) বলেন, একবার আবু সালমা ঘরে এলেন। অতঃপর তিনি হজুর (দ.)-এর একটি হাদিস বর্ণনা করেন। হাদিসটি হলো বিপদ-মুসিবত সম্পর্কিত। বিপদে পতিত হলে ‘ইন্নালিল্লাহ্’ পাঠ করার পর দোয়া হিসেবে, “হে আল্লাহ্! আমার এ বিপদে আমি তোমার কাছে উত্তম বিনিময় আশা করি। হে আল্লাহ্! আমার এ বিপদের পর আমাকে এর চেয়ে তুমি উত্তম বিনিময় দান করো।” হ্যরত আবু সালমা (রা.) এর ইন্তিকালের পর উম্মে সালমা উক্ত দোয়া নিয়মিত পাঠ করতেন। দোয়াটি যেহেতু হজুর (দ.) এর ইরশাদ সেহেতু এই দোয়ার প্রতি উম্মে সালমার উত্তম আশা অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। এর ফল স্বরূপ শোক দিবস অতিবাহিত হবার পর বিশ্বনবী (দ.) এর পক্ষ থেকে তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব আসে। এ ধরনের সর্বোত্তম প্রস্তাব আসলে তিনি হজুর (দ.) সমীপে তাঁর নিজের কিছু ওয়র (সমস্যা) স্পষ্ট করে তুলে ধরেন। এগুলো হচ্ছে (১) তাঁর (উম্মে সালমা) বয়স বেশি। (২) তাঁর সন্তান আছে এবং ইয়াতিম শিশু আছে। (৩) তাঁর আত্মর্যাদাবোধ বেশি যা হজুর (দ.)-এর জন্যে অপ্রত্যাশিত হতে পারে। এ সকল ওয়র বিষয়ে হজুর (দ.) তৎক্ষণিকভাবে বলেন, (১) আমার বয়স তোমার থেকে বেশি। (২) সন্তানসমূহ রাসূলের সন্তান হিসেবে গণ্য হবে। (৩) তোমার স্পর্শকাতর স্বভাবের আত্মর্যাদাবোধ চলে যাওয়ার জন্যে আমি দোয়া করব। উপর্যুক্ত কথোপকথনের ভিত্তিতে ৪৮ হিজরীর শাওয়াল মাসের শেষ সপ্তাহে হজুর (দ.)-এর সঙ্গে উম্মে সালমার বিবাহ হয়।

আহলে বাইত এর ঘটনা : একদিন নবী করিম (দ.) হ্যরত উম্মে সালমা (রা.) এর গৃহে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় ‘আয়াতে তাতহির’ অবতীর্ণ হলো। নবী করিম (দ.) হ্যরত ফাতিমাতুজ্জ জোহরা (রা.), হ্যরত আলী (রা.), হ্যরত ইমাম

হাসান (রা.) এবং হ্যরত ইমাম হোসাইন (রা.) কে ডেকে আনলেন। তাঁদের ওপর নিজের কম্বল জড়িয়ে দিলেন এবং বললেন, “ইলাহি আমার! এরা আমার আহলে বাইত”। হ্যরত উম্মে সালমা (রা.) জিজেস করলেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমিও কি আহলে বাইত?” তিনি বললেন, “তুমি তোমার স্থানে আছো এবং ভালো আছো”।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, নবী করিম (দ.) জবাবে বলেছিলেন, “হ্যাঁ, আল্লাহ্ চাইলে”। আয়াতে ‘তাতহির’ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রাপ্ত এবং হজুর (দ.) এর পবিত্র চাদরে অন্তর্ভুক্তদের প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে হ্যরত উম্মে সালমা সর্বাবস্থায় ‘পাক পঞ্চতন’ তথা আহলে বাইতের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত বিন্দু, বিনীত এবং প্রচণ্ড আবেগপ্রবণ। কারবালা প্রান্তরে সংঘটিত মর্মান্তিক ঘটনা সম্পর্কে বিশ্বনবী (দ.) তাঁর হজরাতে অবস্থানকালে আল্লাহ্ পক্ষ থেকে প্রথম অবহিত হন এবং উম্মে সালমা (রা.) কে তা জ্ঞাত করেন। পবিত্র আহলে বাইতের সদস্যগণের তাঁর হজরায় যাতায়াত ছিল অবাধ এবং অবিচ্ছিন্ন আন্তরিকতায় ভরপুর। হ্যরত হোসাইন (রা.) এর শাহাদতের দুঃসংবাদ শুনে তিনি বলে ছিলেন, ‘ইরাকীরা হোসাইনকে (রা.) হত্যা করেছে। খোদা তাদের হত্যা করবেন। তারা হোসাইনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। খোদার অভিশাপ তাদের ওপর। কারবালার শোকাবহ ঘটনার পর ইমাম জয়নুল আবেদীন (রা.) উম্মুল মুমিনীন হ্যরত সালমা (রা.) এর গৃহে প্রবেশ করে দীর্ঘ সময় অবস্থান করেন এবং তাঁকে কারবালার সমস্ত ঘটনা পূর্বাপর বর্ণনা করে শোনান। তখন উভয়ে বিরামহীন অশ্রুপাত করেন।

উম্মে সালমা (রা.) এর বৈশিষ্ট্য : নবী করিম (দ.) এর প্রতি তাঁর অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিলো। তিনি রাসূল (দ.)-এর পবিত্র মোচ বরকত হিসেবে রূপার একটি কৌটাতে সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে, সাহাবীদের মধ্যে কেউ কষ্ট পেলে তিনি এক পেয়ালা পানি ভরে তাঁর কাছে আনতেন। তিনি পবিত্র মোচ বের করে পানিতে নাড়তেন। এ পানির বরকতে কষ্ট দূরীভূত হয়ে যেত।

হ্যরত উম্মে সালমা (রা.) আল্লাহ্ ইবাদতের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। রমজান মাস ছাড়াও প্রত্যেক মাসেই মাঝামাঝি সময় তিনটি রোজা রাখতেন। তাঁকে অত্যন্ত বড় যাহেদ বলা হতো।

একবার উম্মে সালমা (রা.) একটি স্বর্ণের হার পরেছিলেন। কিন্তু নবী করিম (দ.) তা অপছন্দ করলেন। ফলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তা খুলে ফেললেন এবং ভেঙ্গে ফেললেন।

এগারো হিয়রীতে নবী করিম (দ.) অসুস্থ হলে উম্মে সালমা (রা.) প্রায়ই তাঁর (দ.) কাছে যেতেন। একদিন নবী করিম (দ.) কে খুবই অসুস্থ দেখে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। তখন নবী করিম (দ.) নিষেধ করে বললেন, “মুসিবতের সময় উচ্চস্থরে

ক্রন্দন করা মুসলমানদের জন্য ঠিক নয়।”

উম্মে সালমা (রা.) তাঁর পিতার মতো দানশীলা ছিলেন। কোনো অভাবগ্রস্ত লোক তাঁর গৃহ থেকে শূন্য হাতে ফিরে যেত না। হৃদায়বিয়ার সন্ধির পর কাবা গৃহে হজ করতে গমন করলে কুরাইশরা তাতে অসম্মত হওয়ায় হজ সমাপন সম্পন্ন হয়নি। এতে সাহাবাদের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হলে উম্মে সালমার (রা.) পরামর্শে হজুর (দ.) নিজে পশ্চ কোরবানী দিয়ে স্বীয় মস্তক মুণ্ডন করলে সাহাবারাও তা দ্রুত সম্পন্ন করেন। এতে জটিলতার অবসান ঘটে। উম্মে সালমার সৌন্দর্য বর্ণনায় উম্মুল মু'মিনীন হ্যরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বলেন, “আমি তাঁর রূপ ও সৌন্দর্যে ঈর্ষাণ্বিত ছিলাম।”

উম্মে সালমা (রা.) ৩৭৮টি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি খুব সুন্দরভাবে কোরআন শরিফ তেলাওয়াত করতেন। নবী করিম (দ.) এর তেলাওয়াতের সাথে তাঁর তেলাওয়াতের সাদৃশ্য ছিলো। মহান আল্লাহ্ তাঁকে সুন্দর দৃষ্টিশক্তি, জ্ঞান, মেধা এবং সঠিক রায়ের নেয়ামত দান করেছিলেন।

উম্মে সালমা (রা.) এর ওফাত : হ্যরত উম্মে সালমা (রা.) ৬৩ হিজরীতে ৮৪ বছর বয়সে ওফাতপ্রাপ্ত হন। হ্যরত আবু হৱায়রা (রা.) তাঁর জানায়া পড়ান। উম্মুল মু'মিনীনদের মধ্যে তিনিই সর্বশেষ ওফাতপ্রাপ্ত হন।

হজুর (দ.)-এর ওরসে তাঁর কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি। আবু সালামার (রা.) পক্ষ থেকে চার সন্তান (দুই পুত্র এবং দুই কন্যা) জন্ম নিয়েছিল। তাঁদের নাম হলোঃ প্রথম, সালমা (রা.). তিনি হাবশায় জন্মগ্রহণ করেন। রাসূলে করিম (দ.) হ্যরত হাময়ার (রা.) কন্যা উমামার (রা.) সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়, ওমর (রা.) হ্যরত আলীর (রা.) খিলাফতকালে তিনি বাহরাইন ও পারস্যের রাজস্ব আদায়কারী ছিলেন। তৃতীয় ও চতুর্থ যয়নব (রা.) এবং দুররাহ (রা.) (অন্য রাওয়ায়েত অনুযায়ী রোকেয়া) তাঁর কন্যা ছিলেন।

সূত্র :

1. কোরআর শরিফ
2. মোছাম্মাদ আমেনা বেগম, দুইশত একত্রিশ জন মহিলা সাহাবী ও বেহেশ্তী রমণীগণ, ঢাকা এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ৩৮/৩ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০।
3. মাওলানা মোহাম্মদ ইলিয়াছ, জান্নাতী ২৭ মহিলা, সিদ্দিকীয়া পাবলিকেশন্স, ৩৮/৩ বাংলা বাজার, ঢাকা।
4. হ্যরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ ছাহেব কান্দলভী (রহ.), হায়াতুস সাহাবা (রা.), দারুল কিতাব, ৫০ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০।

তাওহীদের সূর্য : মাইজভাণ্ডার শরিফ এবং বেলায়তে মোত্লাকার উৎস সন্ধানে

● জাবেদ বিন আলম ●

নবুয়ত এবং বেলায়তের উৎস ও সম্পর্ক বিষয় :

ধর্ম সম্পর্কে আগ্রহী ব্যক্তি মাত্রই অবহিত যে নবুয়ত এমন একটি বিশেষ গুণ যা আল্লাহ তাঁর পছন্দকৃত বিশেষ ব্যক্তিকে দান করেছেন। নবুয়ত সাধনা দ্বারা অর্জন করা যায় না। নবী হলেন মূলতঃ মহান স্রষ্টা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ, বিধি বিধান সম্পর্কে মানব আকৃতিধারী হিসেবে মানব সমাজে সংবাদ প্রদানকারী স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বিশেষ ব্যক্তিত্ব। আল্লাহ নবুয়তের কার্যক্রম পরিচালনায় ওহী (খোদায়ী বার্তা তথা প্রত্যাদেশ) বাহক হিসেবে ফেরেশ্তা হ্যরত জিবরাইল (আ.) কে নিয়োগ করেছিলেন। অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর বাণী নবীদের নিকট প্রেরণের ক্ষেত্রে ফেরেশ্তা জিবরাইল ছিলেন মাধ্যম। এখানে নবীর নিকট ওহী প্রেরণ এবং নবুয়তের কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে আল্লাহ ফেরেশ্তাকে সাক্ষী রেখেছেন। নবুয়তের কার্যক্রম পার্থিব সামাজিক ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ম প্রণালীর সঙ্গে সরাসরি জড়িত বিষয় বিধায় নবুয়ত বিষয়টি (১) স্বয়ং আল্লাহ, (২) ফেরেশ্তা, (৩) নবী, (৪) মানব ও জিন সমাজের সঙ্গে বহুমাত্রিকভাবে সম্পর্কযুক্ত। নবুয়তের বিষয়টি সৃষ্টিকূলের সঙ্গে প্রকাশ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে। তাই আল্লাহ সকলকে অবহিত করে নবীর নাম ঘোষণা দিয়েছেন।

উল্লেখ্য যে ফেরেশ্তার মাধ্যমে নবী সমীপে ওহী নায়িলের পূর্বে আল্লাহর একান্ত সান্নিধ্য অবস্থায় ‘আল্লাহর খলিফা’ মর্যাদা প্রাপ্ত হয়ে সৃষ্টি হ্যরত আদম (আ.)-এর সঙ্গে যে কথোপকথন তথা শিক্ষা প্রদান সম্পর্কিত বিবরণী পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে তা ‘ওহী’ নাকি সরাসরি ‘প্রশিক্ষণ এবং নির্দেশ’ তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। তবে এটি একান্ত ‘অতি গোপনীয় সংলাপ’ তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ কোরআনে বর্ণিত আয়াত অনুযায়ী ধারণা করা যায় এটি হচ্ছে ফেরেশ্তা সহ সকল সৃষ্টির অঙ্গাতে, অজাতে, অনুপস্থিতিতে আল্লাহ কর্তৃক হ্যরত আদম (আ.)-কে প্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান এবং প্রশিক্ষণ। কোরআনের ভাষ্য অনুযায়ী ধারণা করা যায়, “স্মরণ করুন! যখন আপনার প্রতিপালক ফেরেশ্তাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে যাচ্ছি; তখন তারা বলল, আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যারা সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও খুন খারাবি করবে? আমরা তো সর্বদাই আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় নিমগ্ন।” আল্লাহ জবাবে বলেন, আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না। আর তিনি আদমকে সবকিছুর নাম শিক্ষা দিলেন (অর্থাৎ সকল বিষয়ে জ্ঞান দান করলেন)। এরপর এক এক করে সবকিছু ফেরেশ্তাদের সামনে হাজির করে বললেন, ‘তোমরা এগুলোর

নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।’ তারা বলল, ‘আপনি মহাপবিত্র। আপনি আমাদের যা শিখিয়েছেন, তার বাইরে আমরা কিছুই জানি না। আপনি প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী।’ তিনি বললেন, হে আদম! তাদেরকে এগুলোর নাম বলে দাও। তখন আদম সবকিছুর নাম বলে দিলেন। এরপর আল্লাহ ফেরেশ্তাদের বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি, মহাবিশ্বের সবকিছুর অন্তর্নিহিত বাস্তবতা শুধু আমিই জানি এবং তোমরা যা প্রকাশ করো বা গোপন রাখো তা-ও আমার জানা? এরপর আমি ফেরেশ্তাদের বললাম, আদমকে সিজদা করো। তখন ইবলিস ছাড়া সবাই সিজদা করল। ইবলিস অহংকার বশত আমার আদেশ অমান্য করল। ফলে সে সত্য অস্ত্রীকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলো”- (সূরা বাকারা : ২ : ৩০-৩৪)। বেহেশ্তে অবস্থানকালে হ্যরত আদমের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ ‘ওই গাছের নিকট যাইও না, এই ফল খাইও না’ বিষয়টিও সরাসরি প্রদান করা হয়েছে। উপর্যুক্ত আয়াতে করীমায়, ‘আর তিনি (আল্লাহ স্বয়ং) আদমকে সবকিছুর নাম শিক্ষা দিলেন’ কোরআনের ঘোষণা অনুযায়ী লক্ষ্য করা যায় পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি তথা খলিফা হিসেবে প্রেরিত আদমকে আদমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের লক্ষ্যে আল্লাহ স্বয়ং কোন মাধ্যম ব্যতীত যাবতীয় শিক্ষা প্রদান করেছেন। আদমকে খলিফা হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরণের পূর্বে এমনকি নবী ঘোষণা ও ওহী প্রেরণের পূর্বে স্বয়ং আল্লাহ প্রদত্ত এ শিক্ষা আল্লাহর সঙ্গে আদমের পরম নৈকট্য এবং একান্ত অতি গোপনীয় প্রেমমধুর অভিসারজনিত সম্পর্ককে নির্দেশ করছে। এই সম্পর্ক বিষয়ে মহান স্রষ্টা আল্লাহ এবং তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আদম ব্যতীত অন্য কোন সৃষ্টি জগত অবহিত নয়। নবুয়ত প্রকাশ এবং ওহীর মাধ্যমে জনসম্মুখে তা ঘোষণার পূর্বে আল্লাহ তাঁর বান্দাকে প্রেমমধুর সম্পর্কে জড়িয়ে যা গোপনে শিখিয়ে দিয়েছেন, জ্ঞাত করেছেন, তাসাওউফ ধারার তাফসীর কারকদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অনুযায়ী তা হচ্ছে ‘বেলায়ত’। ‘পচা কাদার শুকনো ঠন্ঠনে মাটির’ দেহবিশিষ্ট আদমের মধ্যে আল্লাহর তরফ থেকে ‘রুহ’ প্রবিষ্ট হবার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এই ‘গোপন শিক্ষার’ কারণে ফেরেশ্তাদের সম্মুখে আদম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে স্বীকৃত হন এবং ফেরেশ্তাদের নিকট থেকে আল্লাহর নির্দেশে সিজদা প্রাপ্ত হন। আল্লাহর দরবারে আদমের এই বিশেষ সম্মান প্রাপ্তির উৎস হচ্ছে ‘বেলায়ত’। তাই বলা হয় বেলায়ত আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান যা তিনি প্রেমনিধি হিসেবে বিশেষ বিশেষ আদম সন্তানকে সরাসরি দিয়ে থাকেন। হ্যরত আদম (আ.) কে পৃথিবীতে নবী হিসেবে প্রেরণের পূর্বে আল্লাহ কর্তৃক সরাসরি এ

জ্ঞান প্রাপ্তির বিষয়টি উপর্যুক্ত আয়াত সমূহে স্পষ্ট করা আছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহপাক উল্লেখ করেন, ‘স্মরণ করুন! যখন আপনার রব ফেরেশ্তাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে যাচ্ছি’- (সূরা বাকারা: ২: আয়াতাংশ ৩০)। অর্থাৎ আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীর জন্যে, পৃথিবীতে মানব বসবাসের জন্যে, পথিবীকে আবাদ করে পৃথিবীর বুকে আল্লাহর মহিমা, শান এবং অসীমত্ব প্রকাশ এবং সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে। বেহেশ্তে সার্বক্ষণিক আল্লাহর নৈকট্যে থেকে ইবাদত এবং আরাম-আনন্দে কালাতিপাতের মাধ্যমে পরম সুখ সুধা অবগাহনের জন্যে মানুষ সৃষ্টি করা হয়নি, বরং পৃথিবীতে আল্লাহর ‘খলিফা’র মর্যাদা দিয়ে আদমকে সৃষ্টি করায় ঘাত-প্রতিঘাতের জীবনাচারে সফলতা অর্জনের জন্যে আদমকে বেহেশ্ত থেকে পৃথিবীতে পাঠানোর উসিলা হিসেবে ‘শুধু ঐ গাছের কাছে যাইওনা’ নির্দেশনা আসে। তাফসীরকারকদের মতে নিষিদ্ধ গাছটির শিকড় রৌপ্যের, ডাল স্বর্ণের এবং পত্রপল্লব ছিল সবুজ যবরজদ পাথরের। হ্যারত আদম (আ.) গাছটির প্রতি নজর দিতে চমকানো সৌন্দর্য অবলোকন করে ভাবলেন- সোবহানাল্লাহ, কি সুন্দর বৃক্ষ! আল্লাহ পরম মমতায় তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আদমকে বৃক্ষটি দান করে এই গাছের ফল ‘গন্দম’ ভক্ষণ করতে নিষেধ করেন। এরপর একদিকে আল্লাহর নির্দেশনা এবং ইবলিশের প্ররোচনার মধ্যে হ্যারত আদম (আ.) আল্লাহর নির্দেশনার প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে সবর এখতিয়ার করে বৃক্ষের নিকট গমন এবং ‘গন্দম’ ভক্ষণ থেকে বিরত থাকেন। তখনই ইবলিশের প্রতি হ্যারত হাওয়াকে ‘গন্দম’ ভক্ষণে প্রলুক্ত করে তার প্রবৃত্তি জাগিয়ে দিতে নির্দেশ আসে। এই পর্যায়ে গোপন আওয়াজ ভেসে আসে, ইলাহী! এতে কি কারণ নিহিত রয়েছে। আল্লাহ তখন তাঁর মখলুককে জানিয়ে দেন, ‘এতে আমার কিছু গোপন রহস্য নিহিত রয়েছে। আমি তাকে (আদম) জানাতের বাগান থেকে দুনিয়ার বাগানে পাঠাব। তাতে আমার কুদরত এবং মর্যাদার আধিক্য প্রকাশিত হবে।’ হ্যারত আদম (আ.) কে পৃথিবীতে প্রেরণের লক্ষ্যে সংঘটিত বিষয়ের আলোকে পবিত্র কোরআনের ঘোষণা, “কিন্তু ইবলিস তাদেরকে প্রলুক্ত করলো। পরিণামে জানাত থেকে তারা বহিকৃত হলো। আমি বললাম, তোমরা (ইবলিস বনাম মানব সম্প্রদায় তথা আদম হাওয়া) একে অন্যের শক্রজুপে দুনিয়ায় যাও। কিছুকালের জন্যে তোমরা সেখানেই জীবন যাপন করবে”- (সূরা বাকারা: ২:৩৬)।

পবিত্র কোরআনে আদম সৃষ্টি সম্পর্কে দয়াময় আল্লাহ আরো উল্লেখ করেন, “আর আপনার পালনকর্তা যখন ফেরেশ্তাদেরকে বললেন: আমি পচা কর্দম থেকে তৈরি বিশুঙ্খ ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি একটি মানবজাতির পত্রন করব। অতঃপর যখন তাকে ঠিকঠাক করে নেব এবং তাতে আমার রূহ থেকে ফুঁক দেব, তখন তোমরা তার সামনে সিজদায় পড়ে

যেয়ো। তখন ফেরেশ্তারা সবাই মিলে সিজদা করল। কিন্তু ইবলিস - সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে স্বীকৃত হলো না - (সূরা হিজর : ১৫: ২৮-৩১)। সূর হিজর এর, “নাফাখ্তু ফীহি মির রুহী” আয়াতের অর্থ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত ‘সুফি শব্দের উৎপত্তি ও তাসাওউফের পরিসর’ প্রবন্ধে অনুবাদ হচ্ছে, “আমি আমার রুহকে তার মধ্যে (আদমের কুলবে) ফুঁকে দিয়েছি।” উপর্যুক্ত আয়াত অনুযায়ী দেখা যায় রুহ একজাত নিঃসৃত অবিনশ্বর শক্তি, এক রহস্যময় গুণ ধন - যা আল্লাহ মানুষকে দান করেছেন। মানব কুলবে প্রবিষ্ট রুহ হচ্ছে ‘আমরি রাবি’ অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ। এই আয়াত অনুযায়ী দেখা যায় আদম আকৃতি ‘খালক’ তথা সৃষ্টি হলেও রুহ হচ্ছে ‘নির্দেশ’। আদম কুলবে প্রবিষ্ট রুহ হচ্ছে ‘রুহল কুদ্সী’ তথা পবিত্র আত্মা। আদমের কুলবে এই পবিত্র আত্মা ফুঁকে দেয়ার কারণে নূরের সৃষ্টি ফেরেশ্তারা আদমকে সিজদা করার জন্যে আদিষ্ট হয়। উল্লেখ্য যে ‘রুহল কুদ্সী’ অসৃষ্টি। এটি জাতে পাক-পরোয়ার। এ বিষয়ে বিশ্বনবী হ্যারত মুহাম্মদ (দ.) বলেছেন, “আমি আল্লাহর নূর হতে এসেছি এবং সমস্ত সৃষ্টির উত্তর আমার নূর হতে।” এখানে ‘এসেছি’ এবং ‘সৃষ্টি’ শব্দ দ্বয়ের অর্থ এক ও অভিন্ন নয়। বরং নূরের অবিচ্ছিন্ন গতি প্রবাহ এক স্তর হতে অন্য স্তরে এসে বিভিন্ন নাম ও রূপে রূপান্তরিত হয়েছে মাত্র। নূরের বিভিন্ন রূপান্তর আল্লাহর সৃষ্টিজাত বৈশিষ্ট্য। তবে আল্লাহর আদেশ ও বিকাশজাত নূরে মুহাম্মদীর এই গুণ স্তর আহমদী রহস্যের এক অনিবাচনীয় সীমাহীন পাথার। আহমদী রহস্যের এই অবস্থান রুহল কুদ্সী, নূরে জাতী ও নফসে রাহমানীর সাথে যুক্ত ও একীভূত। প্রকৃত অর্থে বেলায়তের অবস্থান ও উৎস এখানেই নিহিত। হ্যারত কায়ী সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) তাফসীরে মাযহারীতে রূহ দু’প্রকার উল্লেখ করেছেন। “(১) স্বর্গজাত, (২) মর্ত্যজাত। স্বর্গজাত রূহ আল্লাহ তা’লার একটি একক সৃষ্টি। এর স্বরূপ দুর্জ্যে। অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন মনীষীরা এর আসল স্থান আরশের উপরে দেখতে পান। কেননা, এটা আরশের চাইতেও সূক্ষ্ম। স্বর্গজাত স্তর হচ্ছে কুলব, রূহ, সির, খফী, আখসা-এগুলো আদেশ জগতের সূক্ষ্ম তত্ত্ব। আর মর্ত্যজাত রূহ যা মানবদেহের চারটি উপাদানে গঠিত- যেমন অগ্নি, পানি, মৃত্তিকা ও বায়ু। মানব রূহের এই ধারাকে বলা হয় ‘নফস’।” রূহ হচ্ছে “আমরি রাবি” অর্থাৎ প্রতিপালকের সরাসরি আদেশ। প্রতিপালকের সরাসরি আদেশ হিসেবে প্রবিষ্ট ‘রুহল কুদ্সী’র সদাজগ্নত এবং প্রেমমত্তার বিষয়ে আল্লাহ পবিত্র কোরআনে সূরা মায়েদা’য় “ইউহিবুরুহম ওয়া ইউহিবুনাহ” কালাম করেছেন। অর্থাৎ যে আল্লাহর সাথে প্রেম করে আল্লাহ তার সাথে প্রেম করেন। আল্লাহর সাথে প্রেমের এই ধারার নাম বেলায়ত। বেলায়তের অন্তর্নিহিত অবস্থান এখানে নির্ধারিত থাকায় বেলায়তের বিষয় অতি গোপনীয় এবং কোন প্রকার মাধ্যম এখানে নেই। অন্যদিকে একই অবস্থান থেকে নবুয়তের ধারায় ‘রুহল কুদ্সী’র উপর প্রবর্তিত ওহী

তথা প্রত্যাদেশ মাধ্যম হিসেবে ফেরেশ্তার অবস্থান কোরআনেই বর্ণিত আছে।

মহান স্রষ্টা রাবুল আলামীন তাঁর একান্ত-একক পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আদমকে ‘কিছু কালের জন্য’ পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। পৃথিবী আদমের নিকট অদেখা, অচেনা, অপরিচিত বিদেশ। এখানে আদম অসহায়। বেহেশ্তে অবস্থানকালে পরিণয় সূত্রে জীবন সঙ্গনী হিসেবে অভিষিক্ত বিবি হাওয়া পৃথিবীতে প্রেরণের পথে আদম (আ.) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। একজন সিংহলে অন্যজন আবিসিনিয়ায়। এ ঘটনায় হাকীকতের একটি পরম উৎস নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। (১) মহান স্রষ্টা আল্লাহর একান্ত সান্নিধ্যে অবস্থান এবং নৈকট্য থেকে পৃথিবীতে এক পাঠিয়ে আদম-হাওয়ার প্রাণে ‘আনচান’ সৃষ্টি করা। মাইজভাঙ্গারী সঙ্গীতে বিষয়টি গীত হয়েছে এভাবে, “একা মোরে এ বিদেশে পাঠায়েছ কোন সাহসে-আছ তুমি ঘরে বসে হৃদয় পাষাণে”। (২) আল্লাহ জাল্লাহুন্নুহুর অনন্ত অসীম পবিত্র দরবার থেকে হ্যরত আদম-হাওয়ার ‘বহিক্ষার’ হচ্ছে পারম্পরিক দূরত্বে অবস্থানের মধ্যে বিচ্ছেদের অনল প্রবাহ জাগিয়ে দেয়া। মাইজভাঙ্গারী সঙ্গীতে এটি বর্ণিত হয়েছে “বিচ্ছেদের অনলে সদাই অঙ্গ জলে-বিনয় করি গো প্রিয়া আয় আয় রে”। অর্থাৎ দেখা যায় বিচ্ছেদের এই অবস্থান হচ্ছে প্রেম জগতের অনিবাগ শিখা। প্রেমডোরে আবদ্ধ অবস্থান থেকে কিছুকালের জন্যে বিচ্ছেদ অবস্থায় রাখার মাধ্যমে আল্লাহ আদমকে মনের দাহনে হৃদয়ে প্রচণ্ড তাপ-উত্তাপ ছড়িয়ে বিশেষ পরীক্ষায় অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহর নৈকট্য থেকে কিছু সময়ের বিচ্ছেদই হচ্ছে আদমের জন্য পরীক্ষা। প্রেমের এ পরীক্ষায় পৃথিবীতে ঘুরে ঘুরে আদম-হাওয়ার আর্তনাদ, আত্মউৎপীড়ন, আত্মচীৎকার হচ্ছে অনন্ত অসীম চির জাগরুক চিরন্তন সত্তা আল্লাহ’র সঙ্গে মিলন পথের অভিযান্ত্রিকের অবিরাম বিলাপ। এ ধরনের বিলাপ-বিষাদের চরম বিক্ষেপণের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করার অভিলাষ নিয়েই স্বয়ং আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, “অতএব তোমরা আমাকেই স্মরণ করো। আমি তোমাদের স্মরণ করব। তোমরা শোকর গোজার হও, অক্তজ্ঞ হয়ো না”- সূরা বাকারা: ২:১৫২। (৩) উপর্যুক্ত আয়াতে করীমায় আল্লাহর প্রতি সার্বক্ষণিক পরম ও প্রেমময় আনুগত্যের নির্দেশনা স্পষ্ট করা হয়েছে। আল্লাহকে স্মরণ করার অর্থ হচ্ছে কোন প্রকার বিনিময়ের প্রত্যাশা না করে সকল বিষয়ে আল্লাহর খলিফা হিসেবে আল্লাহর সৃষ্টির কল্যাণে কাজ করা। (৪) আল্লাহর পরম প্রিয় সৃষ্টি আদমকে পৃথিবীতে প্রেরণের অন্য লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী আল্লাহর সার্বিক পরিচিতি প্রকাশ করা, অসীমত্ব সম্পর্কে ধারণা দেয়া। (৫) পৃথিবীতে হ্যরত আদমকে প্রেরণের অনন্য উদ্দেশ্য হচ্ছে সকল সৃষ্টির প্রতি “স্রষ্টাজাত” বৈশিষ্ট্য এবং আচরণ কার্যকর করে স্রষ্টার অবিরাম সৃষ্টিধারা এবং রূপান্তর, পরিবর্তন এবং বিবর্তনের বিকাশ ঘটানো। (৬) আদমের মাধ্যমেই আল্লাহ প্রমাণ রেখেছেন যে সকল সৃষ্টিতে আল্লাহর একক সত্ত্বাই শুধু

বিরাজমান, আল্লাহই পরম এবং চরম সার্বভৌম, ‘কিছুকালের জন্য’ পৃথিবীতে আদমের অবস্থানের মাধ্যমে আল্লাহ সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন সকল সৃষ্টিই লয়শীল, একমাত্র আল্লাহই বিদ্যমান। অতএব দেখা যায় আল্লাহর দরবার থেকে ‘কিছুকালের জন্য’ আদমের বিচ্ছিন্ন হ্বার বিষয়টি প্রেমান্তর থেকে প্রেমিকের সাময়িক বিচ্ছিন্নতা তথা বিচ্ছেদ। তবে অনন্ত বিচ্ছেদ নয়। পরম অসীম অনন্ত প্রেমসত্ত্ব থেকে এ ধরনের বিচ্ছিন্নতার ফলে প্রেমিকের অনন্তকালব্যাপী মিলন আকাঙ্ক্ষার লক্ষ্যে বিচ্ছেদের অন্তহীন জ্বালার অগ্নি উদ্গীরন এবং অবিরাম নয়ন ধারা-অশ্রূজল বিসর্জন করে চেষ্টা চালানোর নাম তাসাওউফের পথ। এই পথে সম্পর্কের যথাযথ স্থিতির নাম বেলায়ত। বিচ্ছেদ বেদনার অনল প্রবাহের কর্মধারা ও সিদ্ধতার মাত্রানুযায়ী বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে বেলায়ত তথা আল্লাহর সঙ্গে প্রেমজাত সম্পর্কের বহুরূপের প্রকাশ ঘটে থাকে।

‘কাসাসুল আম্বিয়া’ ও অন্যান্য গ্রন্থসমূহে উল্লেখ আছে, আল্লাহর প্রিয় নবী হ্যরত ইব্রাহীম (আ.) নমরান্দের অগ্নিকুণ্ডে নিমজ্জিত হলে হ্যরত জিবরান্দিল (আ.) তাঁকে উদ্বারের জন্যে এগিয়ে এসে প্রস্তাব করেন, “হে ইব্রাহীম! আপনি চাইলে আমার একটি মাত্র পালক মেরে নমরান্দের অগ্নিকুণ্ড সাগরে নিক্ষেপ করব।” জিবরান্দিলের এ প্রস্তাব আল্লাহর নির্দেশ কিনা হ্যরত ইব্রাহীম কর্তৃক তা জিজ্ঞাসিত হলে জিবরান্দিল জবাবে ‘না’ উত্তর দেন। তখন হ্যরত ইব্রাহীম (আ.) বলেন, “ওহে জিবরান্দিল! মহান স্রষ্টা পালন কর্তা আল্লাহর ইচ্ছা মাফিক কাজ করুন।” জিবরান্দিল এ ধরনের কথার উত্তর জানতে চাইলে হ্যরত ইব্রাহীম (আ.) তখন বলেন, ভাই জিবরান্দিল! এর একটা মর্মার্থ অবশ্যই আছে। আর তা হচ্ছে, আপনাকে আমার কোন প্রয়োজন নাই। আমার প্রয়োজন সেই মহান সন্তার নিকট, সমগ্র জগত যাঁর মুখাপেক্ষী।” নমরান্দের অগ্নিকুণ্ডে হ্যরত ইব্রাহীম নিক্ষিপ্ত হলে তাঁর গায়ে পরিহিত নমরান্দের জামা জলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে হ্যরত ইব্রাহীমের কোন কষ্ট হয় নি। এ সময় অদৃশ্য জগত থেকে মহান আল্লাহর কুদরতের কঢ়ে ধ্বনিত হয়- “ইয়া নারুকুনী বারদাও ওয়া সালামান আলা ইব্রাহীম; ওয়া আরদু বিহী কাইদান ফাজা আলনাহুমুল আখসারীন।” অর্থাৎ, হে অগ্নি! তুমি ইব্রাহীমের উপর প্রশান্তি দায়ক শীতল হয়ে যাও। আর যারা তার অমঙ্গল কামনা করছিল, তাদেরকেই আমি খারাপ অবস্থায় নিপত্তি করেছি”- (সূরা আম্বিয়া : ২১ : ৬৯-৭০)। হ্যরত ইব্রাহীমের প্রতি আল্লাহর অপার মহিমাজনিত এই নির্দেশনা আল্লাহর কুদরতি কঢ়ে ধ্বনিত হয়েছে বিধায় এখানে মাধ্যম হিসেবে হ্যরত জিবরান্দিল (আ.) এর উপস্থিতি বর্ণিত হয়নি। এ দৃশ্য অবলোকন করে হ্যরত জিবরান্দিল আশ্চর্য হয়ে বলেন, “আল্লাহর কুদরত দর্শনে আমি সন্তুষ্টি আশ্চর্যান্বিত হয়েছি।” হ্যরত ইব্রাহীম (আ.) এর প্রতি পরম সদয় আচরণের জন্যে অগ্নির প্রতি আল্লাহর নির্দেশ এসেছে সরাসরি। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির প্রতি যখন পরম মমতায়

কোন মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি একান্ত কোন আদেশ-নিষেধ-নির্দেশ প্রদান করেন তা প্রেম তাড়নাভুক্ত বিষয়। তাসাওউফের ভাষায় তা ‘বেলায়ত’ নামে অভিহিত। হ্যরত মুসা (আ.) এর সঙ্গে আল্লাহর সরাসরি কথোপকথনের বিষয়টি পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে। কথোপকথনের এক পর্যায়ে আল্লাহ হ্যরত মুসা (আ.)-এর রিসালতের ঘোষণা দেন। আল্লাহর ঘোষণা শুনে হ্যরত মুসা (আ.) হতবাক হয়ে যান। এ পর্যায়ে হ্যরত মুসা (আ.) এর উপর পতিত কথোপকথনের ভৌতি দূরীভূত করে তাঁকে স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে বন্ধুসুলভ বাচন ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করেন, “ওয়ামা তিলকা বিহ্যামীনিকা ইয়া মুসা।” অর্থাৎ- “হে মুসা! তোমার ডান হাতে ওটা কী? আল্লাহ তাঁর নবীর সঙ্গে এ ধরনের সরাসরি কথোপকথনের মাধ্যমে যে সকল নির্দেশ প্রদান করেছেন তা মূলতঃ একান্ত আপনজন সুলভ আলাপ।

আল্লাহর সরাসরি শিক্ষা প্রদান বিষয়ে হ্যরত মরিয়ম এবং হ্যরত ঈসা (আ.) প্রসঙ্গে সূরা মরিয়মে বর্ণিত ঘটনাপঞ্জীর আলোকে এক পর্যায়ে লোক লজ্জায় হ্যরত মরিয়ম (আ.) যখন লোকালয় থেকে দূরে অবস্থান করে সন্তান প্রসব করেন তখন সন্তান ধারণ এবং প্রসব সম্পর্কিত কোন প্রশ্নের জবাব দিতে তিনি অক্ষম বলে মহান আল্লাহকে অবহিত করেন। নিজের সন্তানকে কোলে নিয়ে তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের সম্মুখে যখন উপস্থিত হন তখন জনগণের নানামুখী প্রশ্নের উত্তর দান বিষয়ে স্বীয় নবজাতক শিশুর প্রতি ইঙ্গিত করেন। পবিত্র কোরআনের ভাষায়, “মরিয়ম শিশুর দিকে ইঙ্গিত করল। ওরা বলল, কোলের শিশুর সঙ্গে আমরা কেমন করে কথা বলব?” শিশুটি বলে উঠল, “আমি তো আল্লাহর বান্দা! তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন ও নবী করেছেন। আমি যেখানেই থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন জীবিত থাকা পর্যন্ত নামায কার্যে ও যাকাত আদায় করার। আমাকে আমার মায়ের সেবক করেছেন। তিনি আমাকে উদ্বৃত্ত ও হতভাগ্য করেন নি। যে দিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি সেদিন আমার প্রতি ছিল সালাম, যেদিন আমি মারা যাব আর যেদিন পুনরুদ্ধিত হবো সেদিনও থাকবে সালাম”- (সূরা মরিয়ম : ২৯-৩৩)। হ্যরত ঈসা (আ.) দোলনার শিশু থাকা অবস্থায় জনসাধারণের সংশয় এবং পুঁজীভূত প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন স্বীয় কঢ়ে। মহান আল্লাহ তাঁর ‘কুন-ফায়া কুনের’ অসীম কুদরতি ক্ষমতাবলে নবজাতক শিশুর কঢ়ে সরাসরি যে বিবরণী জনগণকে শুনিয়েছেন এতে অন্য কোন মাধ্যম ছিল না। এই অদৃশ্য ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই। আল্লাহ নিজেই পবিত্র কোরআনে বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণ রেখেছেন যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুর উপরই তিনি মহাপরাক্রমশালী, সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান একক ও অদ্বিতীয়।

পবিত্র কোরআনে হ্যরত দাউদ (আ.)-এর সময়ে একজনের মেষের পাল কর্তৃক রাতে অন্যজনের ক্ষেত্রে খেয়ে ফেলা এবং নষ্ট করা সম্পর্কে বিচার প্রক্রিয়া বিষয়ে উল্লেখ আছে, “স্মরণ

করো দাউদ ও সোলায়মানের কথা। একজনের মেষের পাল রাতে অন্যের ক্ষেত্রে ঢুকে ফসল নষ্ট করার মামলার বিচার যখন তাঁরা করছিল, আমি তাঁদের বিচার পর্যবেক্ষণ করছিলাম। আমি তখন সোলায়মানকে সঠিক ফয়সালা বুঝিয়ে দিলাম”- (সূরা আম্বিয়া : ২১ : আয়াতাংশ ৭৮-৭৯)। উপর্যুক্ত বিচার চলাকালে হ্যরত সোলায়মান (আ.) পিতা হ্যরত দাউদ (আ.) এর পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি তখন অল্পবয়স্ক। এ সময়ে আল্লাহ সামগ্রিক বিচার-ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে হ্যরত সোলায়মান (আ.)-এর মাধ্যমে যে বস্তুনিষ্ঠ সমাধান প্রদান করেন তা অধিকতর কল্যাণমূলক এবং বিবেচনাধর্মী। হ্যরত সোলায়মান তখন নবী ঘোষিত হন নি। কিন্তু তাঁর মধ্যে আল্লাহ কুদরতি ধারায় যে হিকমত দান করেছেন তা অন্য কেউ জ্ঞাত হন নি। এ হিকমতের অবস্থান একমাত্র আল্লাহ এবং হ্যরত সোলায়মান (আ.) এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ ধরনের বিষয় নবুয়ত ধারার মতো নয়। এগুলো মূলতঃ আল্লাহর সঙ্গে তাঁর প্রিয় বান্দার একান্ত প্রেমময় সম্পর্ক।

এ প্রসঙ্গে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত মিরাজ শরিফ। এটি এমন একটি ঘটনা যাতে মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয়তম নবী (দ.) কে উর্ধ্বজগতে পরিভ্রমণ করিয়ে বরকতময় করেছেন। উর্ধ্বজগতে ভ্রমণকালে সিদরাতুল মুনতাহা অতিক্রম করে তাঁকে মহান স্তুতির একান্ত ইচ্ছায় অনন্ত অসীমতার স্থান সরীফুল আকলামে নেয়া হয়। সেখানে মহান আল্লাহর সঙ্গে বিশ্বনবী (দ.) এর অবস্থানের দূরত্ত থাকল ‘মাত্র দুই ধনুকের বা তার চেয়েও কম’। এ অবস্থানে আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীবের প্রতি নাযিল করেন ‘যা তিনি করতে চেয়েছিলেন।’ উল্লেখ্য যে শবে মিরাজের এ শুভ সন্ধিক্ষণে যা “মুআনাকারে ইশ্ক” হিসেবে সর্বাধিক প্রশংসিত সে সময় দিনে পাঁচবার সালাতের বিধান হ্যরত মুহাম্মদ (দ.) কে সরাসরি বকশিস হিসেবে প্রদান করা হয়। অর্থাৎ সালাত জারীরকালে আল্লাহ এবং বিশ্বনবী (দ.)-এর সঙ্গে সংযোগের জন্য কোন মাধ্যম রাখা হয়নি। তবে সালাত সম্পর্কে পরবর্তী সময়ে বিধি বিধানসহ ওহী নাযিল হয়। শবে মিরাজে ‘যা করতে চেয়েছিলেন’ আল্লাহ তা করেছেন। কোন মাধ্যম ছাড়া সরাসরি এ সম্পর্ক এবং অন্তহীন দানকালে ‘দৃষ্টি বিভ্রমও হয়নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি’। এটি হচ্ছে প্রেমিক প্রেমাস্পদের অন্তহীন অভিসার-এক অনন্য লক্ষ্য-অনন্ত অসীম প্রেমময়ের প্রতি পরম প্রেমানুগত্য-যা ইবাদত এবং বন্দেগী। আল্লাহর প্রতি প্রেমানুগত্যের মাধ্যমবিহীন এ ধারার নাম বেলায়ত।

বিদায় হজে বিশ্বনবী (দ.) এর ঐতিহাসিক ভাষণে আগত-অনাগত বিশ্ববাসীর জন্যে চিরস্মৃত কল্যাণের সার্বিক নির্দেশনা ছিল। আরাফাতের ভাষণের পর হজের যাবতীয় আহকাম সম্পন্ন করে বিশ্ব নবী (দ.) মদীনা শরিফের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। এর মধ্যে ১৮ জিলহজ বৃহস্পতিবার হজুর (দ.) জুহফা অঞ্চলে পৌছেন। সেখানে পথিমধ্যে হ্যরত

জিবরাইল (আ.) আগমন করে ওহী পৌছান। শেষ পর্যায়ের এই ওহীতে উল্লেখ আছে, “হে রাসুল, পৌছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌছালেন না। আল্লাহ্ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা করবেন। নিচয় আল্লাহ্ কাফেরদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না- (সূরা মায়েদা: ৫:৬৭)। এ আয়াতের তাৎপর্যপূর্ণ অংশ হচ্ছে নবুয়ত প্রকাশের শেষ পর্যায়ে ‘আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌছালেন না’ – এই পয়গাম সম্পর্কে তাফসীরকারদের প্রায় সকলেরই মন্তব্য হচ্ছে এ আয়াত নাজিল হবার পর হজুর (দ.) ‘গাদীরে খুম’ নামক চৌরাস্তার মাথায় থেমে যান। এখানে তিনি সকল হাজীদেরকে সমবেত হতে নির্দেশ দেন। ইতোমধ্যে যারা সিরিয়া ও ইরাক অভিযুক্ত রওয়ানা দিয়েছিলেন তাদেরকেও ফিরে আসতে নির্দেশ দেন। সুবিশাল জনসমূহে তিনি একটু উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে মহান আল্লাহ্ সানা-সিফত বর্ণনাত্তে আল্লামা ইবনে কাসীরের আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৫ খণ্ডের ৩৪৯-৩৫০ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত তথ্যানুযায়ী উল্লেখ আছে বিশ্বনবী হ্যরত মুহাম্মদ (দ.) ঘোষণা দেন, “তোমরা অবগত নও কি? কিংবা (তিনি হজুর (দ.) বলেছিলেন) তোমরা সাক্ষ্য দিচ্ছ না কি যে, আমি প্রতিটি ঈমানদারের জন্যে তার নিজের চাইতে আপন? “তারা বলল, জী হ্যাঁ, নিচয়। তিনি বললেন, তবে আমি যার আপন ও অভিভাবক (মাওলা) নিচয়ই আলীও তার আপন ও অভিভাবক (মাওলা)। ইয়া আল্লাহ্! যে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে আপনি তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করুন এবং যে তার সঙ্গে বৈরীতা করে আপনি তার সঙ্গে বৈরীতা রাখুন।” ইমাম বায়হাকী, সুনানে কুবরা, হাদিস নং ১৯৭৩৬, মুত্তাকি হিন্দি, কানজুল উম্মাল, হাদিস নং ৪১১৪১, ইমাম সুযুতী, জামেউল আহাদীস, হাদিস নং ৩৩৬৭৮ অনুযায়ী উল্লেখ করা হয় কেউ কেউ বলেন, রাসুলুল্লাহ্ (দ.) হ্যরত আলীকে মাওলা ঘোষণা করার পর বলেন, “আল্লাহ্ আকবর, দ্বীন পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এবং নেয়ামত সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। আমার রব আমার রেসালত ও আলীর বেলায়তের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়েছেন।” পবিত্র কোরআনে এবং বিদায় হজ্বের ভাষণে সুস্পষ্ট ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও বিশ্বনবী (দ.) গাদীরে খুমে দুটি বিষয় পুনরায় সকলকে স্মরণ করিয়ে দেন। এ দুটি বিষয় সম্পর্কে হ্যরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) এর বর্ণনানুযায়ী, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেছেন, “মহান প্রজ্ঞাবান আল্লাহ্ তা’আলা আমাকে জানিয়েছেন যে, এ দুটি বস্তু কিয়ামতের দিনে হাউজে কাউসারে আমার নিকট না পৌছা পর্যন্ত একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। প্রথমটি আল্লাহ্ কিতাব যা হেদায়ত ও নূরে পরিপূর্ণ। অতএব তোমরা আল্লাহ্ কিতাবকে ধারণ কর এবং মজবুত করে আঁকড়ে ধর। দ্বিতীয়ত: আমার আহলে বাইত। আমি আমার আহলে বাইত সম্পর্কে তোমাদেরকে আল্লাহ্ কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমার

আহলে বাইত সম্পর্কে আল্লাহ্ কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমার আহলে বাইত সম্পর্কে আল্লাহ্ কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। অতএব, তোমরা লক্ষ্য কর আমার পরে দুটির সঙ্গে তোমরা কিভাবে আচরণ কর”- (তিরমিজি শরিফ, কিতাবুল মানাকিব, হাদিস নং-৩৭৮৮)। গাদীরে খুমে প্রদত্ত ভাষণটি বিশ্বনবী (দ.) এর প্রতি মহান আল্লাহ্ রাবুল আলামিনের একান্ত বিশেষ নির্দেশনা, যা সূরা মায়েদা ৬৭নং আয়াতে বর্ণিত আছে। দেখা যাচ্ছে মহান আল্লাহ্ খাতেমুন্নবী (দ.) কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একান্তে অবহিত করেছেন। গাদীরে খুমের ভাষণের বিষয় এবং ঐতিহাসিক নির্দেশনা এর অনন্য একটি। বিশ্বনবী (দ.) বিভিন্ন সময় তাঁর সাহাবা কেরামের মর্যাদা সম্পর্কে প্রকাশ্যে অনেক অভিমত প্রদান করেছেন। হ্যরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) কে সিদ্দীকে আকবর, হ্যরত উমর (রা.) কে ফারুকে আযম, হ্যরত উসমান গণি (রা.) কে যুনুরাইন, হ্যরত আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা.) কে উম্মতের আমিন, হ্যরত আবুয়র গিফারী (রা.) কে পরম সত্যবাদী, হ্যরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) কে হক এবং ন্যায়ের পথে অবস্থানকারী লকবে অভিহিত করেছেন। হ্যরত আবু বকর সিদ্দীক এবং হ্যরত উমর ফারুক (রা.) কে পৃথিবীতে তাঁর ডান এবং বাম পাশের উজির ঘোষণা দিয়েছেন। সূরা জুমাহ’র শেষ আয়াতে আশ্রা মোবাশ্শরা সম্পর্কে ইঙ্গিত থাকা সত্ত্বেও রাসুলুল্লাহ্ (দ.) দশজন সাহাবীর নাম উল্লেখ করে প্রকাশ্য খুতবায় তাঁদের বেহেশ্তবাসী ঘোষণা করেছেন। এ ধরনের অনেক বিষয় যা আল্লাহ্ একান্ত গোপনীয় সিদ্ধান্ত -যা বিশ্বনবী (দ.) কে পূর্বাহ্নে অবহিত করে প্রকাশ করে দেয়ার অনুমতি দিয়েছেন। এ সকল গোপন সিদ্ধান্ত সমূহ হজুর (দ.) কে অবহিত করার ক্ষেত্রে কোন মাধ্যম ছিল না। আল্লাহ্ এবং তাঁর প্রিয়তম রাসূলের এ ধরনের অকল্পনীয় সম্পর্কের ভিত্তি হচ্ছে বেলায়ত। হ্যরত মুহাম্মদ (দ.) একদিন উম্মুল মু’মিনিন হ্যরত আয়েশা (রা.) কে হঠাৎ বললেন, “ডাক, হ্যরত আয়েশা বললেন কাকে? হজুর (দ.) পুনরায় বললেন, ডাক। হ্যরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বললেন, আবু বকর কে? হজুর (দ.) বললেন-না। উম্মুল মু’মিনিন অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন উমর কে? হজুর (দ.) বললেন-না। উম্মুল মু’মিনিন পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, উসমান কে? এবার বিশ্বনবী (দ.) বললেন, উসমান কে ডাক। এরপর হ্যরত উসমান যুনুরাইনকে আসার জন্যে সংবাদ প্রেরণ করা হল। হ্যরত উসমান আস্লে হজুর (দ.) তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে খিলাফতের জুরু পরিধান করাবেন। তখন অনেক অঘটনার সূত্রপাত ঘটবে। তোমাকে খিলাফত ত্যাগ করতে প্রচণ্ড চাপ দেয়া হবে। কোন অবস্থায় তুমি পরিধেয় খিলাফতের জুরু খুলতে পারবে না। তোমার জীবনের আশংকার মধ্যে চরম ও পরম ধৈর্য ধারণ করে দায়িত্ব পালন করতে হবে। কোন অবস্থায় নিজে সংঘর্ষের সূত্রপাত করতে পারবে না। আমার নির্দেশনা অনুযায়ী অন্যত্র

হলে সূরা আরাফের ৪০নং আয়াতাংশ উল্লেখ করে ‘একটি সুইয়ের ছিদ্র দিয়ে উটের প্রবেশ যেমন অসম্ভব’, তেমনি তোমার পক্ষে জাল্লাতে প্রবেশ অসম্ভব হবে। হজুর (দ.) এর নির্দেশনা অবহিত হয়ে হ্যরত উসমান (রা.) খুবই বিমর্শ হয়ে পড়েন। অবশ্য পরবর্তী সময়ে হ্যরত উসমান (রা.) সশন্ত্রভাবে আক্রান্ত হয়ে শাহাদত বরণ সত্ত্বেও সেনাবাহিনী বা মদিনাবাসীর একান্ত আগ্রহ সত্ত্বেও বিদ্রোহীদের দমনের জন্যে অন্ত চালনার নির্দেশ দেন নি। হ্যরত উসমানের (রা.) প্রতি বিশ্ব নবী (দ.) এর উপর্যুক্ত নির্দেশনা আল্লাহর গোপন তথ্যের বহিঃপ্রকাশ-যা বেলায়ত ধারার অন্তর্ভুক্ত।

আমীর মোয়াবিয়ার সঙ্গে সন্ধির বিষয়ে আহলে বাইত হ্যরত হাসান (রা.) এর ভূমিকা এবং উম্মাহর মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনা সম্পর্কে বিশ্বনবীর (দ.) পূর্ব ঘোষণা, কারবালা প্রান্তরে ইসলাম ধর্মের মৌলিক কাঠামো উজ্জীবিত এবং সংরক্ষণের লক্ষ্যে আহলে বাইত হ্যরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর নির্মম শাহাদত সম্পর্কিত পূর্ব ঘোষণাও বেলায়ত ধারার বহিঃপ্রকাশ। হজুর (দ.) একদিন সাহাবা কেরামের মজলিশে ইয়েমেন থেকে খুশ্ব আসার খবর সকলকে অবহিত করেন। সাহাবা কেরামের জিজ্ঞাসার জবাবে হ্যরত ওয়ায়েস করণীর (রহ.) হজুর (দ.) এর প্রতি বিশেষ মহবতের প্রসঙ্গ জ্ঞাত করে বলেন তার সাথে উমর এবং আলী ব্যতীত তোমাদের অন্য কারো সাক্ষাত ঘটবে না। হজুর (দ.) হ্যরত ওয়ায়েস করণীর জন্যে রক্ষিত খিরকা হ্যরত আলী (রা.) এবং হ্যরত উমর সমীপে পেশ করে তা পরবর্তী সময়ে তাঁকে সমর্পন করার নির্দেশ দেন। হ্যরত আলী (রা.)-এর শাহাদত যা হ্যরত শোয়াইব (আ.)-এর উন্নৈ হত্যাকারীর মতো হতভাগার কাজ বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন এ ধরনের অসংখ্য বিষয় যা আল্লাহর অসীম তথ্য খনি থেকে সরাসরি হজুর (দ.) সমীপে পেশ করা হয়েছে বলে বন্ধমূল ধারণা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত আছে। উন্নের যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে হ্যরত মাওলা আলী (রা.) হ্যরত যুবাইর (রা.) কে যে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার কারণে হ্যরত যুবাইর এবং হ্যরত তালহা যুদ্ধ ক্ষেত্র ত্যাগ করেছিলেন তাও ছিল হজুর (দ.) এর পেশ করা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত গোপন তথ্য।

বিশ্বনবী হ্যরত মুহাম্মদ (দ.) এর একটি উপাধি হচ্ছে “মাখ্যানা আসরারিল্লাহ্”। অর্থাৎ তিনি হলেন আল্লাহর গুণ রহস্যের ভাণ্ডার। গুণ রহস্য বলতে প্রধানত অদৃশ্য জগতের অসীমত্ব এবং কর্মতৎপরতাকে নির্দেশ করে। এটি স্রষ্টা-সৃষ্টি, রূহ জগতসহ সবকিছুকে বুঝায়। হ্যরত মুহাম্মদ (দ.) এর অন্য একটি খেতাব হচ্ছে “মুবাশ্শারি বিল মাকাম”-অর্থাৎ তিনি হলেন নির্দিষ্ট স্থানের সুসংবাদ দানকারী। হজুর (দ.) মহান স্রষ্টা আল্লাহ’র অবস্থান, তৎপরতা, রূপান্তর, পরিবর্তন, বিবর্তন সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত এবং জ্ঞাত। ফলে তিনি সৃষ্টি বিষয়ে সুসংবাদ দানকারীর অধিকার প্রাপ্ত। এটি বিশ্বনবী (দ.) এর অতুলনীয় গোপন এবং রহস্যজনক অবস্থান। মহানবী (দ.) তাঁর পরম মহিমান্বিত এ অবস্থান সকল

সাহাবাকে সমভাবে জ্ঞাত করেননি। সাহাবা কেরামের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনাচার, ত্যাগ, সাধনা-রিয়াজতের মান ভেদে তা তিনি প্রয়োজনে কোন কোন সাহাবাকে বিশেষভাবে জ্ঞাত করেছেন।

এটি চিরন্তন সত্য যে নবুয়ত এবং বেলায়ত দুটি বস্তু হলেও উৎস এক এবং অভিন্ন। বেলায়তে মোত্লাকা’র ভাষায়, “নবুয়ত ও বেলায়ত দুটি বস্তু হলেও বেলায়ত নবুয়ত স্তরে নবীর সন্তানে একত্রিত হয় এবং ভিন্নভাবে বিকশিত অবস্থাতে দৃশ্যতঃ নবীর শরীয়তী হুকুমের বাধ্য নাও থাকতে পারে। যেহেতু ইহারা খোদার জাহেরা হুকুম অপেক্ষা খোদার ইচ্ছা শক্তিকে অধিক প্রাধান্য দান করেন ও ধর্মীয় হেকমত এবং মঙ্গল বুঝিয়া কাজ করেন এবং করিবার অধিকারীও হন। ইহা খোদার নিকট প্রিয়।” এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনের সূরা কাহাফ এর ষাট থেকে বিরাশি আয়াতে বর্ণিত নবী হ্যরত মুসা (আ.) এবং বর্ণিত দরবেশ [যিনি হ্যরত খিয়ির (আ.) নামে অভিহিত] এর কথোপকথন ও ঘটনাপঞ্জীর মধ্যে নবুয়ত এবং বেলায়তের সম্যক বিষয় সহজভাবে অনুধাবন করা যায়। নবুয়তে যেহেতু আল্লাহ ফেরেশ্তাদেরকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন সেহেতু নবুয়তে প্রকাশ্য সাক্ষী থেকেছে। তাই নবুয়তে স্থলনের সম্ভাবনা ছিল না। বেলায়ত অতি সংগোপনীয় তথ্য প্রবাহ এবং প্রেমিক-প্রেমাস্পদের একান্ত সম্পর্কজনিত বিষয় বিধায় তা অত্যন্ত স্পর্শকাতর। প্রেমিক-প্রেমাস্পদের সুগভীর সম্পর্কের মধ্যে সামান্যতেই যে কোন সময় বিচ্যুতির সম্ভাবনা থাকে। মাইজভাণ্ডারী সঙ্গীতে প্রেমিক-প্রেমাস্পদ স্পর্শকাতর সম্পর্ক বিষয়ে সাবধান করে গীত হয়েছে, “হেলিও না দুলিও না থাকিও সাবধানে”। একই বিষয়ে পবিত্র কোরআনে হুঁশিয়ারী রয়েছে, “হে নবী! ওদেরকে সেই লোকের কথা (বালআম বিন বাউরার ঘটনা। বলআমের আব্দিয়দত অর্জনটি ছিল সাধনা ও চেষ্টা অসূত, আজলী তথা মাদারজাত নয়) শুনিয়ে দিন, যাকে আমি আমার কালামের জ্ঞান দান করেছিলাম। কিন্তু পরে সে তা পরিত্যাগ করে। শয়তান এমনভাবে তার পেছনে লাগে যে, সে পথভ্রষ্টদের মধ্যে শামিল হয়। আমি ইচ্ছে করলে কালামের জ্ঞান দিয়ে তার মর্যাদা সম্মুল্লত করতে পারতাম। কিন্তু সে পার্থিব জীবনের আসক্তিতে পড়ে গেল আর দাস হয়ে গেল প্রবৃত্তির। আসলে তার অবস্থা হলো সেই কুকুরের মতো, যাকে আপনি তাড়া করলেও জিহ্বা বের করে হাঁপাতে থাকে আর তাড়া না করলেও বসে বসে জিহ্বা বের করে হাঁপায়। যে সম্প্রদায় আমার বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে, তাদের অবস্থানও একই রকম। অতএব হে নবী! আপনি ওদের কাছে এ ঘটনা বর্ণনা করেন, যাতে ওরা একটু ভাবার সুযোগ পায়— (সূরা আরাফ : ৭:১৭৫-১৭৬)। উপর্যুক্ত আয়াতে পাক থেকে বেলায়ত বিষয়ে স্পর্শকাতরতাও অনুধাবন করা যায়। বেলায়ত যেহেতু পরিপূর্ণভাবে প্রেমজাত তাড়না সেহেতু অতি সূক্ষ্ম বিষয়েও আশেককে

মাশুকের জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। আশেকের জন্যে এটি অত্যন্ত ভীতিকর অবস্থা। একটুতেই মাশুকের সঙ্গে সম্পর্ক ছান এমনকি ছিন্ন হতে পারে। এ বিষয়ে উপর্যুক্ত আয়াতের আলোকে সাবধানতা অবলম্বনের নির্দেশনা স্মরণে রাখা তৃরিকতপছীদের জন্য অত্যাবশ্যক। বেলায়ত সম্পর্কে মাইজভাণ্ডারী সঙ্গীতে বর্ণিত হয়েছে, “তোমার আমার গোপন কথা না কহিও যথা তথা-পাড়ার লোকে জানিতে না দিও।” অর্থাৎ বেলায়তের বিষয়টি নবুয়তের মতো প্রকাশ্য ঘোষণা করা যায় না, তবে কার্যকারণ এবং রূপকভাবে মানব অন্তরে-সমাজ-পরিবেশ অনুযায়ী লোকসমাজে প্রভাব সৃষ্টি করে পরিবর্তন সাধনের লক্ষ্যে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী বেলায়ত প্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব ক্ষমতা প্রদর্শন করেন কোন সময় প্রকাশ্যে কোন সময় সংগোপনে। এ ধরনের কার্য সাধন আল্লাহর ইচ্ছা শক্তির প্রকাশ ব্যতীত অন্যকোন কারণে বা ব্যক্তি স্বার্থে করা সঙ্গত নয়। অর্থাৎ বেলায়তের দায়িত্ব কার্যকারণের মাধ্যমে প্রকাশযোগ্য, গোপন উৎস বর্ণনা বা প্রকাশ্যযোগ্য নয়। এক কথায় বেলায়ত আল্লাহর ইচ্ছাশক্তির বহিঃপ্রকাশ, কোন অবস্থায় বেলায়তপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্বের স্বেচ্ছা লাভালাভের বিষয় নয়।

শিরোনাম অনুযায়ী নবুয়ত এবং বেলায়তের উৎস সম্পর্কিত আলোচনা পর্যবেক্ষণ করলে লক্ষ্য করা যায় মানবজাতির হেদায়তের পত্তা হিসেবে নির্দেশিত নবুয়ত এবং বেলায়তের উৎস এক এবং অভিন্ন। পবিত্র কোরআনের গৃঢ় রহস্যপূর্ণ কিছু আয়াতের সুগভীর তত্ত্ব এবং অন্তর্নিহিতভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মহান স্মৃষ্টি আল্লাহ রাকুল আলামিন পৃথিবীর জন্যে মানব সৃষ্টি করেছেন তাঁর কুদরত এবং মর্যাদার আধিক্য প্রকাশের নিমিত্তে। পৃথিবীতে মানবজাতি পারস্পরিক বিবাদ, কলহ, সংঘাত, রক্তপাত, হিংসা-বিদ্বেশ, ফ্যাসাদ পরিহার করে শান্তিপূর্ণভাবে সাময়িক সময়ের জন্যে কালাতিপাতের সুবিধার্থে হেদায়তের পথ নির্দেশক হিসেবে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। মানব সমাজের অনুধাবন এবং বোধ-বোধনের সুবিধার্থে মানব আকৃতিধারী নবী-রাসূলগণ আল্লাহর অনন্ত-অসীম ভাণ্ডার থেকে ফেরেশ্তা হ্যরত জিবরাইল (আ.) এর মাধ্যমে ওহী তথা ঐশ্বী পয়গাম বা অদৃশ্যজগতের বাতাপ্রাপ্ত হয়ে পৃথিবীতে মানব সমাজের আচার-আচরণ, কর্ম এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়ে নির্দেশনা দিয়ে হেদায়তের পথে আহ্বান জানান। নবুয়তের শৃঙ্খলা এবং বিধান অনুযায়ী অদৃশ্য জগতের বার্তা ফেরেশ্তার মাধ্যমে প্রেরিত হয়েছে। মানবজাতিকে পথ নির্দেশের নিমিত্তে জারীকৃত নবুয়তের বিধানে কথা, বার্তা, বক্তব্য প্রদান এবং আমল-আদল প্রদর্শন নবীদের জন্যে আবশ্যিক হিসেবে নির্দেশনা ছিল। ফলে প্রত্যেক নবী-রাসূল কথা বার্তা, ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে তাঁদের সমীক্ষে প্রেরিত ঐশ্বীবার্তা জনসমাজে পেশ করতেন। জনসমাজের হেদায়তের লক্ষ্যে সর্বশেষ প্রেরিত অদৃশ্য জগতের বার্তা তথা আসমানী গ্রন্থ আল-কোরআনের মাধ্যমে পৃথিবীতে মানবজাতির বসবাস

উপর্যোগী সত্য, ন্যায় এবং শান্তির জন্যে বিধান ভিত্তিক পয়গাম জানিয়ে দেয়া হয়। এর মাধ্যমে মূলতঃ পৃথিবীর জন্যে সরাসরি নবুয়ত ধারার সমাপ্তি ঘটে। বিশ্বভক্ষাণের সকলের জন্যে প্রেরিত নবী হিসেবে হ্যরত মুহাম্মদ (দ.) আখেরী নবীর ‘সীল’ ধারণ করে খাতেমুল আম্বিয়া, খাতামুন নবী হিসেবে মানবজাতির হেদায়তের সার্বিক পথ প্রদর্শন করে, ‘আমার পরে আর কোন নবী আসবে না’- ঘোষণা দেন। নবুয়ত জারী থাকা অবস্থায় লক্ষ্য করা যায় যে, আল্লাহ তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি আদম জাতির সদা কল্যাণ প্রত্যাশা করে যুগে যুগে মানবজাতির হেদায়ত প্রাপ্তির লক্ষ্যে দেশ, জাতি, গোত্র, জনসমাজ এমনকি মহল্লা-মহল্লায় নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবগোষ্ঠীর জন্যে এ ধারা অব্যাহত রাখার প্রধান কারণ হচ্ছে বারংবার সত্য এবং মহৎ পথ থেকে বিচ্যুত মানবজাতিকে উদ্ধার করে আল্লাহ নির্ধারিত পথে ফিরিয়ে আনার অবিরাম তাগাদা এবং প্রচেষ্টা। ধার্মিকতার প্রাদুর্ভাবে অনেক সময় নবুয়তের প্রভাব জনসমাজে দুর্বল হয়ে পড়ে, এমনকি নবী এবং নবুয়তকে অস্বীকার করে লোকসমাজ দুষ্টের দাঙ্গিকতায় ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। তখন নবীর অবর্তমানে আল্লাহর একান্ত ইচ্ছা শক্তিতে প্রেম প্রেরণাদীষ্ট বেলায়তধারী বিশেষ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে। বেলায়ত যা আল্লাহর একান্ত ইচ্ছাধীন সংগোপনীয় ব্যবস্থা “আর তিনি আদমকে সবকিছুর নাম শিক্ষা দিলেন” ধারার সঙ্গে সংযুক্ত তা আল্লাহ কখনো বন্ধ রাখেন নি। নবুয়তের পর মানবজাতির হেদায়ত প্রাপ্তির লক্ষ্যে বেলায়তের ধারাকে প্রাধান্য দিয়ে উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। বিশ্বনবী (দ.) ‘গাদীরে খুম’ নামক স্থানে হজ ফেরত পুণ্যার্থীদের বিশাল সমাবেশে ভাষণের মাধ্যমে অনুপম চরিত্রের পরমাত্মায় অনুজ অনুগামী হজুর (দ.) এর জ্ঞান ভাণ্ডারের দরজা এবং উক্ত জ্ঞান ভাণ্ডার বিষয়ে পরম গোপনীয়তা সংরক্ষণে প্রতিশ্রূত আহলে বাইত হ্যরত আলী (রা.)-এর হস্ত স্বীয় পবিত্র হস্তে ধারণ করে উর্ধ্বে তুলে ধরে বেলায়তের কার্যধারার উদ্বোধন করে ‘মাওলা’র অভিষেক সম্পন্ন করেন। ইতোপূর্বে উন্মৃত হাদিস শরিফ অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (দ.) গাদীরে খুমের ভাষণে সবশেষে ঘোষণা দেন, “আল্লাহ আকবর, দ্বীন পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এবং নেয়ামত সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। আমার রব আমার রেসালত ও আলীর বেলায়তের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়েছেন।” মাইজভাণ্ডারী সঙ্গীতের পরিভাষায় “আমার গাউসুল আয়ম কেবলাকাবা ভাণ্ডারী, নবুয়তের পরে হলো বেলায়ত জারী।”

‘আয়নায়ে বারী’ কিতাবের ভাবার্থ

● এস এম সেলিম উল্লাহ ●

(মাহিজভাগ্নার শরিফের তাসাওউফ ধারা সম্পর্কে ধারণাপ্রাপ্তি সম্পর্কিত বিস্ময়কর গ্রন্থ হচ্ছে ‘আয়নায়ে বারী’। মূল গ্রন্থ আররি, ফাসি, উর্দু, হিন্দি ভাষার সংমিশ্রণে কাব্যিক ধারায় লেখা। গ্রন্থের লেখক বাহারুল উলুম মাওলানা সৈয়দ আবদুল গণি কাঞ্চনপুরী হলেন হয়রত গাউসুল আযম মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাহিজভাগ্নারী (ক.)’র অন্যতম খলিফা এবং জ্ঞান অন্বেষী বুজুর্গ। মূল ভাষায় প্রকাশের পর থেকে গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্যে বিভিন্ন শ্রেণির পাঠকের মধ্যে প্রবল আগ্রহ দেখা দেয়। কিন্তু বাংলা ভাষায় গ্রন্থটি অনুবাদ না হওয়ায় এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনেকাংশে আরবি-ফাসি ভাষা জানা ব্যক্তিদের মতামত ও ব্যাখ্যার উপর ধারণা নিয়ে সন্তুষ্টি থাকতে হয়। পাঠকদের একান্ত আগ্রহ লক্ষ্য করে আলোকধারা কর্তৃপক্ষ গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদের লক্ষ্যে কয়েকবার উদ্যোগ নেন। অবশেষে মাওলানা এস এম এম সেলিম উল্লাহ গ্রন্থটির কাব্যরীতি ঠিক রেখে বাংলা ভাষায় অনুবাদের সূত্রপাত করেছেন। গ্রন্থটির অনুবাদ মাসিক আলোকধারায় প্রকাশের মাধ্যমে পাঠক চাহিদা পূরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। —সম্পাদক]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর : তৃতীয় কিস্তি)

গজলের ভাবার্থ:

প্রেম মদিরার ঐ পাত্র গুঞ্জন
তুর্কি প্রাচ্য প্রতীচ্যময়,
পান আগ্রহীর নিদ্রা শক্র
অপেয় করল মোরে নিশয়।
প্রভুত্বময় ঐ সাম্রাজ্যে
অহংকারী অগ্রাহ্য রয়,
মকরুলময় রাত্রেও সে
প্রভু পূজায় প্রহণীয় নয়।
তাঁর একবিন্দু দয়ায় ধৌত
আমল নামার পাপ অয়েময়,
খোদা প্রেম যার নেত্রকোণে
রক্তাশ্র সদা বিকির্ণয়।
তাঁর প্রেমিক হয় খোদার প্রেমিক
শক্রও প্রভুর শক্র হয়,
তাঁর মুরিদান খোদার দরগায়
দ্রুত পৌঁছে যায় নিশয়।
আরশ উর্ফে উল্লীত শির
হয়ে যায় তার ঐ সময়,
আমার এ দুর্দিনেও তাঁর
দয়ার নজর পেলেই হয়।
“মুরিদি লা তাখাফ্” তাঁর
জাতি গুণ বৈশিষ্ট্যময়,
পীরানে পীরের মুরিদ হলে
ছফী তোমার কী আর ভয়।

হয়রত শাহখুল আকবর মুহিউদ্দীন ইবনুল আরবি (রহ.) “আত তাজাল্লীয়াত” কিতাবে লিখেছেন, যে বস্তু মানবীয় ইন্দ্রিয়ানুভূতি হতে অদৃশ্য, জগতে প্রত্যেক বস্তুর সংবাদ তার কাশ্ফ দ্বারা অর্জিত। কিন্তু মানবী ও জীব জাতি ছাড়া অন্যদের মধ্যে এ বিষয়ে অবগতি নেই। তবে আল্লাহ তায়ালা দয়া করে যাদেরকে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করেছেন তারা ভিন্ন অন্য কেউ তা অবগত নন। একই সূত্রে জীব জন্ম, গাছ পাথর, এমন কোন কিছু বাকি নেই যা প্রকৃতিগতভাবে রাসূল (দ.)-এর নবুয়তের খবর জানেন। অনেক আবদালগণের ঘটনাও এর সাক্ষ্য বহন করে। সে রকম একজন আবদাল যিনি কোহেকাফের ঐ পারে “বাহরে মুহিত” বা ভূ-পৃষ্ঠের চতুর্দিকে বেষ্টনকারী সমুদ্র তীরে গিয়ে দেখলেন বৃহৎ এক সাপ, যেটা পৃথিবীর চারপাশের সীমানা ঘেরা দিয়ে রেখেছে।

অতঃপর তিনি সাপকে সালাম দিলেন। সাপও সালামের উত্তর দিল এবং আবদালের কাছে সাপ শেখ আবু মাদায়েনের (র.) অবস্থা জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন, শেখ আবু মাদায়েনকে তুমি কীভাবে চিন? অতঃপর সাপটা আশ্চর্য হয়ে বলল, “রোয়ে জমিন” বা ভূ-পৃষ্ঠে এমন কেউ আছে কী, যে শেখ মাদায়েনকে চিনেনা এবং তাঁর সাথে মহবত রাখেনা? আল্লাহর কসম যখন আল্লাহ তাঁকে নিজের বন্ধু বানালেন, তখন আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে (তাঁর পরিচয়) ফুঁকে দিলেন এবং ভূ-পৃষ্ঠে প্রত্যেকের অন্তরে তাঁর মুহাবত নায়িল করে দিলেন। এমন কি গাছপালা, তরঙ্গতা পশু পাখি, ধুলিবালি, পাথর, পাহাড়-পর্বত হতে এমন কিছু বাকী নেই যা তাঁকে চিনেনা ও তাঁর মুহাবত অন্তরে রাখেন। অন্তিম অবস্থা আল্লাহই ভাল জানেন।

টীকা: তাফসিলে হোসাইনীর লেখক স্বীয় তাফসিলে লিখেন (ইন্নাল্লাজিনা আমানু) অর্থাৎ “যারা সৈমান এনেছে” এর

ব্যাখ্যা দাঢ়ায় ঈমানে ‘হাকিকী’ বা ‘আইনী’-তারা ‘ওয়া আ’মিলুস সালিহাতি’ তথা কল্যাণময় কাজ সম্পন্ন করেছে। এর ফলে তারা “তাজকিয়া” তথা আত্মঙ্গিক এবং “তাসফিয়া” তথা অন্তরকে পরিপূর্ণভাবে পবিত্র করতে সক্ষম হয়েছে। পবিত্র অন্তরের অধিকারী হওয়ায় তারা প্রবৃত্তির তাড়নামুক্ত হয়ে যায়। এর ফলে তারা আল্লাহর সিফাতি তথা গুণবাচক তাজাল্লী গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করে। পবিত্র কোরআনের ভাষায়, “ছা ইয়াজয়ালু লাহুমুর রাহমান উদ্দা” অর্থাৎ অবশ্যই দয়াময় তাদের জন্য ভালবাসা প্রদান করবেন (সূরা: মারিয়াম-৯৬)। বর্ণিত (হাদিসে কুদ্সিতে) আছে, মুমিন বান্দা নফল আমল দ্বারা ততক্ষণ আমার নৈকট্য চায় যতক্ষণ না আমি তাকে ভালবাসি। যখন আমি তাকে ভালবাসি তখন আমি তার কান হই যা দিয়ে সে শুনে। আমি তার চোখ হই যা দিয়ে সে দেখে। তার হাত হই যা দিয়ে সে ধরে। মূলত এই ভালবাসা “এনায়তে উলা” বা অনুগ্রহের প্রথম ধাপ ও চিহ্ন। যা আল্লাহর বাণী (ইউহিকুল্লম ওয়া ইউহিকুনাল্লতিনি তাদের ভাল বাসবেন, তাঁরাও তাঁকে ভালবাসবে – (সূরা মায়েদা : ৫৪) দ্বারা ক্রটি প্রকাশের স্থান (কলব) প্রসারের পূর্বেই ভালবাসার জন্য মনোনিত করার মাধ্যমে বন্ধুত্ব করা বুঝায়। আল্লাহ তার অন্তরে “আল্লাহর মুহাবত প্রকাশ পাওয়া” আবশ্যক করে দেন যা তাকে পূর্ব ওয়াদা বা “আহাদে ছাবেকা” পূর্ণ করতে অস্ত্রি করে তোলে। অতএব এমতাবস্থায় “হাবিবে মোত্লক” [হজুর (দ.)] এর মুহাবতের কারণে ঐ পূর্ব প্রতিশ্রূতি পূর্ণ জীবিত হয়ে গেল। যেমন ইরশাদ করলেন (কুল ইন কুনতুম তুহিকুনাল্লাহা ফাত্তাবিউনি ইউহিবিকুমুল্লাহ অর্থাৎ বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তাহলে আমার আনুগতা কর (আল-ইমরান-৩১) এবং যখন আ’মাল (কর্ম) ও আহওয়াল (অবস্থায়) বিশুদ্ধ আনুগত্যকারী হয়ে যায় তখন আল্লাহ “মহাবতে এন্টেফা” (মনোনিত মুহাবত)’র সাথে মাহবুব হিসেবে গ্রহণ করেন। এটা “মুহাবতে উলা বা এনায়তে উলা” তথা অনুগ্রহ বা প্রেমের প্রথম ধাপ অপেক্ষা অনেক বড়। এ মুহাবতের কারণে সমগ্র সৃষ্টি জগতের দীলে তার প্রতি ভালবাসা ও ঈমানদারদের নিকট কবুলিয়ত (গ্রহনীয়তা) প্রকাশ পেয়ে গেল। হাদিস শরিফে এসেছে রাসূল (দ.) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহতায়ালা যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন জিব্রাইল (আ.)কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে জিব্রাইল, নিশ্চয় আমি অমুক বান্দার সাথে মুহাবত রাখি তুমিও তাকে ভালবাস। যখন জিব্রাইল তাকে ভালবাসেন আর আসমানবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করে দেওয়া হয় নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, আমিও ভালবাসি, তোমরাও ভালবাস।

অতএব আসমানবাসী তাঁকে ভালবাসতে শুরু করে। এরপর এই ভালবাসা জমিনবাসীদের অন্তরে নায়িল হয়। অতঃপর ভুবনবাসী তাঁকে ভালবাসতে থাকেন। হ্যরত কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত, আল্লাহর কোন প্রিয় বান্দা ততক্ষণ (আল্লাহর প্রতি) প্রত্যাবর্তন করেননা যতক্ষণ না তাদের মুহাবত ও গ্রহণযোগ্যতা লোকের অন্তরে প্রবেশ করানো না হয়। আল্লাহর বাণী “ছাইয়াজয়াল লাহুম রাহমান ওদ্দা অর্থাৎ অবশ্যই দয়াময় তাদের জন্য ভালবাসা প্রদান করবেন” এর এই হল মমার্থ আল্লাহ ভাল জানেন। একদিন এই গুণাহ্গার (লেখক) যার আপাদমস্তক পাপে ভরা, ভূমগরত অবস্থায় এক স্থানে গিয়ে পৌঁছলাম। দেখলাম এক জিয়াফতের অনুষ্ঠানে আশপাশের কিছু শিক্ষিত অশিক্ষিত (আলেম/আওয়াম) লোক একত্রে বসে গল্ল-গুজবে রত। দূর থেকে আমাকে দেখে কতেক আমাম লোক ঐ আলেমরূপী জাহেল, নামকাওয়াস্তা আলেমদের প্ররোচনায় আমাকেও তাদের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে কাকুতি মিনতি করে অনুরোধ করতে লাগল। যখন হঠকারীমূলক বেশি রূপক তোষামোদী করতে লাগল, তখন তাদের অনুষ্ঠানে তো গেলামই না, প্রয়োজন বশত যেখানে দাঁড়ানো ছিলাম ওখানেই বসে পড়লাম। ঐ আলেমরূপী জাহেলদের শিখানো বুলি মোতাবেক এ আওয়ামরা আমাকে জিজ্ঞাস করতে লাগল, আপনারা হ্যরত গাউসল্লাহীল আয়ম মাইজভাণ্ডারী (ক.) কে কেন গাউসুল আয়ম বলেন? তাঁর গাউসিয়তের নিশান বা চিহ্ন কি? আমি উত্তর দিলাম, যে সম্মানিত ব্যক্তিত্ব জমানার গাউস, আল্লাহ ও রাসূলের খলিফা বা প্রতিনিধি হবেন তাঁর জিকির, ইয়াদগারী, যে কোনভাবেই হোক সৃষ্টির প্রত্যেক বস্তুই করে থাকে এবং তাঁর নামে পাকের সম্মান জিন, ইনসান, পশু পাখি, বৃক্ষলতা, বালি পাথর, সর্বকিছুর কঞ্চনায় মনঃপূত ও ধর্তব্য হবে। তারা বলল, এটা কী করে সম্ভব? আমি বললাম, দেখ যখন লোকের ক্ষেত্র খামার পোকা নষ্ট করে বা কোন জীব জল্ল খেয়ে ফেলে তারা তখন আমাদের হ্যরত গাউসে মাইজভাণ্ডারীর (ক.) দরবারে নজরানা মনে মনে মান্নত করে আর তাৎক্ষণিক রক্ষা পেয়ে যায় এবং শস্যক্ষেত সুরক্ষিত থাকে। এখন বুঝা গেল কীট পতঙ্গ বন্য জীব জানোয়ারও হ্যরতের নামে পাকের সম্মান করে। একইভাবে আরো দেখ কোন ফলদার বৃক্ষ ফল না ধরার সময় হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর নামে নিয়াজ মান্নতের কারণে ঐ বৃক্ষে ফল ধরতে থাকে। বুঝা গেল বৃক্ষও হ্যরতের নামে পাকের সম্মান করে। গাউসিয়তের যে নিশান আমরা কিতাবসমূহে পেয়েছি তা আজ স্বচক্ষে দেখছি। তারপরও কেন তাকে গাউসুল আয়ম বলব না। যখন আমি এভাবে উত্তর দিলাম তখন তারা একেবারে দেয়ালের মত চুপ হয়ে গেল। তখন আমি সেখান থেকে উঠে চলে এলাম। এছাড়া অন্য একদিন রমজানুল মোবারক মাসে বারগাহে

গাউসিয়ার আন্তর্বন শরিফের সেবায়েতগণের মনে কোন কারণে হঠাৎ আশা জাগল যে, সম্ভবতঃ আমরা তাঁর [গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী (ক.)] “হঠাৎ (মানুষের) মাকসুদ পূর্ণ করে দেয়ার” বিষয়গুলো প্রত্যক্ষ করতে পারব। কসম খোদা যখন ঈদের নামায পড়ানো হচ্ছে তখন হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী (ক.) ঈদগাহে জায়নামাযে উপবিষ্টাবঙ্গায় শোভা সৌন্দর্য বর্ধিত করেছেন। প্রত্যেকের অন্তরে একথা ঘূরপাক থাচ্ছে যে, আমরা মনে মনে যে কথা সংকল্প করেছি তাতো প্রকাশ পেলনা। এমন মুহূর্তে হ্যরত গাউসে পাক (ক.)’র ব্যঙ্গনাপূর্ণ বাণীর প্রকাশ পেল যে, “অবুৰা বালক, কি বুৰবে? নিজের কাজে তাড়াছড়া কেন? এ জামানায় আমিই ‘গাউস’ ভালমন্দ পাপপুণ্য সব আমার জানা।” যখনি আমরা তা জেনে গেলাম এবং সকলের একিন (নিশ্চিত বিশ্বাস) আরো দৃঢ় হয়ে গেল যে, এ যুগে আমাদের হ্যরতই “গাউস”, দয়াময় আল্লাহত্তায়ালার খলিফা বা প্রতিনিধি।

গজলের ভাবার্থ:

পর্দার আড়ালে রয়েছে এক
এমন জ্যোতিষ্ময় মুখ্যবৃত্ত,
যোমটা হলে অপসারণ
নূরানী মুখ দেখা যেত।
কেশররাজির অন্তরালে
ঐ জ্যোতিষ্মান মুখ লুকায়িত,
তাই বুঝি বর্ণনা কিরণ
দৃশ্যত ঐ রবির মত।
ভোরের হাওয়া খোদার ওয়ান্তে
হইও তারি আর্জিরত,
হীন দাশের জানপ্রাণ
তাঁরি তরে উৎসর্গীত।
আর্শ হতে পর্ণ কিবা
জলস্থলে আছে যত
তাঁর অন্ত রূপবন্ত
গুণগ্রাহে মুখরিত।
প্রশংসায় পঞ্চমুখ
ভানু কিবা অনু যত,
মর্যাদার চতুরে তব
সবাই সজিদায় অবনত।
শত নামায রোজা হতে
ইহাই উত্তম গুণগত,
প্রেমাস্পদের হাস্যোজ্জ্বল মুখ
প্রেমিক তাঁরই প্রেমে মন্ত।
দিলরূপা হে জ্যোতির্ময়ী
এই ইচ্ছায় হলেম আগত,
তব কুকুর দলে যেনো

থাকি অনাদি অনন্ত।
তব নাম জপিব যতদিন
দেহে প্রাণ রয় সঞ্চালিত,
দেহ ছেড়ে যেতে প্রাণ
জ্যোতির্ময় মুখ দেখি মত!
প্রাণবায় যাওয়ার কালে
থাকবে তব পদান্ত
গজল পড়ে নেচে নেচে
প্রাণটি মম হতে গত।
ওহে গাউসে মাইজভাণ্ডারী
বৈর্য কী আর রাখতে পারি?
কাছে টেনে দর্শন দানে
এ অধীনে দাও সওগাত।
প্রশান্তির ধারক ওহে
মোর কাছে হও প্রকাশিত,
তুরময় হৃদয় উত্তাপ
চাহে তোমায় অন্বরত।
বিরহে মকবুলের অন্তর
কুহরিছে অবিরত,
পর্বত কানন জলস্থলে
তোমাকেই খুঁজিছে কত!
অতুল্য ফুল বাগে তুমি
অতুল্য পুষ্পরাজ বটে,
এই ভূমরে একটু সুস্থান
দিলে কি আর কমে যেত॥

তৃতীয় পরতু / রশ্মী : প্রত্যেক দাওরাহ (কাল প্রবাহ)’য় জগৎ স্থির থাকার জন্য জগতে একজন অলি উপস্থিত থাকার বর্ণনা। হাদিস শরিফে এসেছে, যখন পথভ্রষ্টতা ও গোমরাহী পৃথিবীতে প্রকট হয় জগৎবাসী গোমরাহীর শেষ সীমায় পৌঁছে যাওয়ার কারণে খোদা রাসূলের অসন্তুষ্টি বিস্তার লাভ করতে থাকে, তখন আরশ, কুর্সি, আসমান, জমিন, গাছপালা, তরুণতা, ধুলোপাথর গ্রহ-নক্ষত্র জৈব অজৈব প্রাণীজগত বন্যজন্তু পশু-পাখি সমস্ত মাখলুকাত (সৃষ্টিজগত) নিজ নিজ অবস্থা ও ভাষ্যে (খোদার) রাজদরবারে জমিনবাসীর পথ প্রদর্শনের জন্য কান্নাজড়িত কঢ়ে এবং বিলাপ স্বরে অস্ত্রিতার সাথে বারবার প্রার্থনা মিনতি করে, তখন পরম করণাময়ের দয়ার সমুদ্র উদ্বেলিত হয় এবং আপন পরিপূর্ণ দয়া ও ব্যাপিত পরমোৎকৃষ্টতায় তাদের প্রার্থনা গ্রহণ করেন এবং নিজের কোন এক প্রেমলালিত বান্দাকে জমিনবাসীর পথ প্রদর্শনের জন্য মনোনীত করেন এবং তাঁর বক্ষস্থলকে হিংসা ঘৃণা ও সমস্ত মন্দাচার হতে পুতুপবিত্র করেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের আলো ও আদি অন্তের রহস্য পরিচিতি দ্বারা তাঁর অন্তর আলোকিত

করেছেন এবং দৃশ্য অদৃশ্য জগৎসমূহের রহস্যাদি তাঁর (অনন্ত সমুদ্রে ভাসমান) জাহাজময় বক্ষে নিরাপদে গচ্ছিত রাখেন এবং আপন গুণ্ঠতথ্য বা রহস্যের একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু বানিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন এবং “সাহেবে কিতাব” (অবর্তিকা প্রত্তের ধারক) “মালিকে শরিয়ত” (ধর্মীয় বিধি নিষেধের অধিকারী) “মোখতারে হাকীকত” (হাকীকতের ক্ষমতাবান) তাঁকেই বানান এবং “সমস্ত সৃষ্টি জগতের উপর তাঁর আনুগত্য ও ‘এভেবা’ কে ‘ফরয’ করে দেন” এবং তাঁর নাফরমানিকে দুর্কুল ধ্বংসের কারণ বলে গণ্য হয় তাঁর এভেবাকেই নিজের (আল্লাহর) সম্পত্তির মূল হিসেবে সাব্যস্ত করেন এবং তাঁর আনুগত্যতা অস্বীকার, অবাধ্যতা, ধৃষ্টতা ও বিদ্রোহিতাকে আপন (আল্লাহর) অসম্পত্তির হেতু নির্ণয়ে কহর, গজবের কারণ নির্ধারণ করেন। তাঁর জিকিরকে সমুদ্ধত করে দেন ও তাঁর ফজিলতসমূহ লোকের কাছে প্রসিদ্ধ করে দেন। তাঁর আজমত (শ্রেষ্ঠত্ব) ভাবমূর্তি সকলের অন্তরে প্রভাবান্বিত করে জগতবাসীর জন্য নবী রাসূল, খলিফা, নায়েব রূপে নিজ প্রতিনিধি নির্বাচিত করেন। আহলে জমিন বা জগদ্বাসী বরং দৃশ্য অদৃশ্য সকল সৃষ্টি জগতকে তাঁর পবিত্র সত্ত্বার মধ্যস্থতায় হেদায়ত ও পথ নির্দেশনা দান করেন এবং গোমরাহীর জঙ্গল হতে হেদায়তের রাজপথে আনেন। আর তাঁর অনন্ত ফয়জাতের মাধ্যমে জগতকে স্থির রাখেন এবং সমগ্র জগত যেন দেহ আর তাঁর জাতেপাক রূহ সদৃশ্য। এই “খেলাফতে রক্বানী” কোন যুগের জন্য নির্দিষ্ট নয় বরং প্রত্যেক যুগে একজন খোদার প্রতিনিধি পৃথিবীতে স্থিত থাকা আবশ্যিক। যাঁদের মাধ্যমে জগত স্থিত থাকে। কিন্তু (পার্থক্য) এটাই যে, এটা হ্যারত খাতেমুর রিসালাত (দ.) এর পূর্ব যুগে নবুয়ত নামে প্রসিদ্ধ ছিল এবং খত্মে নবুয়তের পরবর্তী যুগে “বেলায়তে উজমা” পদমর্যাদায় এই উপাধি “গাউসিয়ত” নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

আবু দাউদ শরিফ ও অন্যান্য হাদিস সংকলনে রাসূল (দ.) হতে বর্ণনা করেন “নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা এ উম্মতের দ্বীনকে সংস্কারের জন্য প্রতি শতাব্দীর শুরুতে একজন মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) প্রেরণ করেন।” এই কথাকে হ্যারত আরেফ রূমী (রহ.) মসনবী শরিফের দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণনা করেছেন যা এ অধম (লেখক) হ্বহু পদ্য ও গদ্যাকারে নিম্নে বর্ণনা করে দিলাম।

“মসনবী শরিফের ফয়রহানে ইউসুফি অধ্যায়ে উল্লেখ আছে, প্রকাশ থাকে যে, রাসূল (দ.) আপন উম্মতকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন, সাহাবী, তাবে-তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন। জাহেরী আলেমগণের মতে ঐ তিন স্তরের লোকগণ অতীত হয়ে গেছেন। সুফিয়ায়ে কিরাম বলেন, ঐ তিন স্তরের ব্যক্তিবর্গ কিয়ামত পর্যন্ত থাকবেন। কেননা রাসূল (দ.) এটাও ইরশাদ করেছেন “যে আমাকে স্বপ্নে দেখেছে সে তার মত, যে আমাকে

জীবদ্ধশায় দেখেছে।” আউলিয়া কিরামগণের মধ্যে যিনি তাঁকে [রাসূল (দ.) কে] অন্তর চক্ষে বা স্বপ্নযোগে দেখেছেন তিনি হ্যারত ওয়ায়েস করণী (র.)’র মত আসহাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। কেননা এ প্রকার আল্লাহর অলি কিয়ামত পর্যন্ত সর্বদা বিদ্যমান থাকেন বিধায় উম্মতের মধ্যে যে লোক তাঁদের (অলিগণকে) দেখেন তারাও “তাবেয়ীনের” মধ্যে গণ্য। যে তাঁদের (তাবেয়ীন) কে দেখেন সে “তাবে তাবেয়ীন” গণের মধ্যে গণ্য হন। এভাবে উম্মতের সকল লোক কিয়ামত পর্যন্ত “সাহাবী” “তাবেয়ীন” “তাবে-তাবেয়ীন” এই তিন স্তরভুক্ত হয়ে থাকেন। যে বা যারা রাসূল (দ.)-এর স্থলাভিষিক্ত এই আউলিয়ায়ে কিরামের অস্বীকারকারী হবে তারা আরবের ঐ সব মুনাফিকের মত হবে।

অতএব মাওলানা রূমী (রহ.) গাউস, কুতুব, আবদাল ও অন্যান্য আউলিয়া কিরামের পদমর্যাদা স্তর সম্পর্কে বলেন,

উচ্চারণ: ফছ্ বহরে দওরে অলিয়ে কায়েম আন্ত - তা কিয়ামত আয় - মায়েশ দায়েম আন্ত।

ফছ্ ইমামে হাইয়ে কায়েম আঁ অলিস্ত- খাওয়া আজ্ নছলে উমর খাওয়া আজ আলী আন্ত।

মাহদী ওয়া হাদী অলিস্ত আয় রাহা জু - হাম নেহা ওয়া হাম নিশস্তা পেশে রুহ।

উঁচেহ নূরান্ত ওয়া খিরদে জিবরাইল উ - আঁ অলি কম আয় কন্দীলে উ

ওয়া আঁকেহ যে ঝঁ কন্দীলি কম মিশশত মা আন্ত - নূরে হবা দর মরতবত তরতিব হান্ত।

অর্থাৎ দাওরায়ে জামানা বা প্রতি যুগবৃত্তে একজন অলি জগতে স্থিত গাউসে জামান, রাসূল (দ.) এর খলিফা বিদ্যমান থাকেন, সত্য মিথ্যার পরীক্ষাও কিয়ামত পর্যন্ত জগতে চলমান থাকে। অতএব চিরঞ্জিব হক তায়ালার হক প্রতিনিধি ঐ অলিই হয়ে থাকেন এবং এটা শর্ত নয় যে, তিনি শুধু সৈয়দ বংশীয় হবে। বরং হ্যারত ওমর (রা.) এর বংশীয় বা আলী (রা.) এর বংশীয় বা অন্য কারো বংশীয় হওয়াও জায়েয়। যেমন বিভিন্ন বংশে অলি হতেও দেখা যায়। রাহবারে আলম (জগতের পথ প্রদর্শক) রূপে খোদা অব্বেষণকারী সকল লোকের জন্য প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে ঐ অলিই খোদার খলিফা। সে খোদার খলিফা গাউসুল হকের বর্ণনায় যেমনটি প্রকাশ থাকে যে।

ঐ “ইমামুল হক” বা “গাউসুল কুল” “নূর” হন। আর তাঁর “আকল” আকলে জিব্রাইল। যিনি জগতের কর্মকাণ্ড সমূহের পরিচালনার আদেশ নিষেধসমূহের বর্ণনাকারী। যেমন আকলে নবী (দ.)ই জিব্রাইল (আ.) ছিল। যে অলি এই স্তর হতে নিচের স্তরের সে অলি ঐ নূরের কান্দিল বা প্রদীপ, প্রদীপের স্তরের নিচের স্তর মেশকাত বা “তাক”। অতএব আল্লাহর ঐ নূরের

বিন্যাস এভাবে হয় যেমন আল্লাহ্ বলেন : আল্লাহ্ ভূমগুল ও নভোমগুলের নূর বা জ্যোতি, তাঁর নূরের জ্যোতি উপমা যেন এক দীপাধার ঘার মধ্যে আছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি এক কাঁচের আবরণে স্থাপিত। কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ - (সূরা নূর-৩৫)। অতএব সে নূর “হাকিকতে মুহাম্মদী (দ.)”। আর তা রাসূল (দ.) থেকে যুগের গাউসের জাতে পাকে স্থানান্তরিত হয়। তাঁর “আকল বা বিবেক” ও “আকলে কুল” বা পূর্ণাঙ্গ বিবেক। খোদার সংবাদ প্রদানে জিব্রাইল সদৃশ্য। তার পরের স্তর “আকতাব” যা “কান্দিল” বা প্রদীপ। ঐ নূর যেন প্রদীপে প্রজ্বলিত। তৎপরের স্তর “আউতাদ” যা তাক সদৃশ। ঐ নূরের প্রদীপ যেন তাক বা কাঁচের আবরণে দীপ্তিময়। এভাবে স্তর পরবর্তী স্তর এই নূর সকল অলিগণের মধ্যে প্রজ্বলিত।

উচ্চারণ: যাঁকেজ জাপছদ পর্দাহ্ দারদ নূরে হক্ক - পর্দাহ হয়ে নূর দাঁ ছন্দি ত্বক্ক,
 তরপনে জার পর্তাজ্ বওসে আ সবাস - ছফ ছফ আন্দ ঈ
 পর্দাহ শাঁ তা ইমাম।
 আহলে ছফ্ফে আখেরি আয় যো'ফে খেশ - চশ্মে শাল ত্বাকুত
 নদারদ নূরে পেশ,
 ওয়াঁ ছফ্ফে পেশ আয় যো'ফিয়ে বছর - তাবে নারদ
 রূশনরাঁইয়ে পেশেতৰ।
 রূশনরাঁই কো হায়াতে আওয়ালান্ত - রঙে জাঁও ফিৎনায়ে ঈ
 আহওয়ালান্ত,
 আহওয়ালিহা আন্দক আন্দক কম শূয়দ - চুঁ যে হাপছদ
 বগুয়রদ দায়েম শূয়দ।

অর্থাৎ ঐ “নূরে হক” যা যুগের গাউসের অবয়বে বিকশিত হয় তৎপর্যন্ত পৌছতে ৭০০ পর্দা রয়েছে। প্রত্যেক পর্দার অন্তরায় কাতার কাতার আউলিয়ায়ে কিরামের স্তর রয়েছে। অতঃপর শেষ স্তরে অবস্থানকারী অলিগণ নিজ ঝুহানী শক্তির অক্ষমতার কারণে তৎ উর্ধ্বস্তরের কাতারে অবস্থানকারীর নূর বা জ্যোতি ধারণে সক্ষম নন। যে নূর বা জ্যোতি অগ্রগামীগণের হায়াত বা প্রাণ, তা তৎপরবর্তীগণের জন্য জীবনবিনাশী। কেননা অগ্রগামীগণের তুলনায় অনুগামীগণের অবস্থা এই প্রকারের যে, তাওহীদের পরিপূর্ণ অবস্থা তাঁদের নিকট এখনো প্রকাশ পায়নি। তাঁরা দ্বিত্বাবের স্তরে রয়েছেন। এই দ্বিবিধ ভাবাপন্নতার স্তর ও বহুত্রের পর্দা অল্প অল্প যখন অপসারিত হতে থাকে এবং উরুজীয়ত ও উন্নতির মাধ্যমে ৭০০ পর্দা ভেদ করে তখন দ্বিবিধ ভাবাপন্নতা বিদ্যুরিত করে “ইমামত” প্রতিনিধিত্বের স্তরে পৌছতে পারেন এবং তাঁরা “মারিফাতের” মহা সমুদ্রে পরিগণিত হন। আর সমগ্র সৃষ্টিজগত হয় ঐ সাগরের ঢেউ। ঐ বিভিন্ন স্তরের শক্তি ও দুর্বলতা প্রসঙ্গে

আল্লামা রূমী আরো বলেন,

উচ্চারণ: আতশী কা এছলাহে আহন ইয়া যরান্ত - কয় ছেলাহে
 আবী ওয়া সেবে তরান্ত,
 সেবে আবী খামিয়ে দারদ খফিফ - নে চুঁ আহন তাবশী খাহদ
 লতীফ।
 লেকে আজর আ লতীফ আঁ শু'লাহান্ত - কো জয়োবে তাবশ আঁ
 অযুদাহান্ত।

অর্থাৎ, যে আগুন লোহা বা স্বর্ণকে পরিশুদ্ধ করে তা নাশ্পতি (আপেল) বা পানি জাতীয় বস্তুকে পরিশুদ্ধ করে না। কারণ লোহা ঐ তেজদার আগুনে গরম হয়। আর নাশ্পতি (আপেল) হাল্কা অগ্নি তাপে পরিপক্ষ হয়। একইভাবে যে অলিগণ প্রবল সামর্থ্য রাখেন তাঁরা শক্তিশালী তাজল্লীর ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন হন। যারা দুর্বল চিত্তের তারা ঐ তেজস্বী তাজল্লী ধারণে অক্ষম হন।

উচ্চারণ: হান্ত আঁ আহন ফকিরে চখ্ত কশ - যেরে তবকে
 আতশান্ত ছুরখ্ ওয়া খোশ,
 হাহবে আতশ বুয়দ বে ওয়াসতা, - দর দিলে আতশ রূওদ বে
 রাবিতা।
 বে হিজাবে আব ওয়া ফরজন্দানে আব - পখতগী যে আতশ
 রয়াবদ ওয়া খেতাব।
 ওয়াসতা দেগে বুওদ ইয়া তাবা : যে - হামচু পা রা দর রংশে
 পা তাপা : যে।

অর্থাৎ, লোহাতুল্য সাধক এত সক্ষমতা সম্পন্ন যে সে কঠিন রিয়াজত, নফ্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নামক হাতুড়ির নিচে প্রেম বিদ্ধিতায় প্রসন্নচিত্ত। অর্থাৎ লোহা কোন মাধ্যম ছাড়া আগুনে বিদ্ধ হয় আর পানি জাতীয় ফল বা বস্তু ডেক্চি বা করাইয়ের মাধ্যমে পোক্ত হয়। “ঈমামে হক্ক” “নূরে খোদা”গণ ফয়জে ইলাহীকে বিনা মাধ্যমে গ্রহণ করেন। অন্যান্য আউলিয়াগণ কোন মাধ্যম দ্বারা ফয়েজ পেয়ে থাকেন।

উচ্চারণ: পস্ ফকির আঁস্ত কো খোদ রা দেহদ - আবে
 হায়ওয়ানে কেহ মান্দ তা আবদ,
 পস্ দিলে আলম ওয়া বস্তু যিরাকেহ তন- মিরছদ আয়
 ওয়াছেতা: ঈ দিল বফন।
 দিল নবাশদ তন ছেহ দানদ গুণ্ডগো - দিল নজুয়েদ তন ছেহ
 দানদ জুহতজো,
 পস্ নজরগাহে শু'আ' আ' আহনান্ত - পরস নজরগাহে খোদা
 দিল নায় তনান্ত।
 বআয় ঈ দিলহায়ে জুয় ওয়ে চুঁ তনান্ত - বাদিলে ছাহবে দিলী

কো মাদনান্ত,
বস্মিছাল ওয়া শরাহ্ত খাহ্দ স্টি কালাম - লেকে তরছম তা
নালগযদ ফহমে আ'ম।
তা নগরদদ নেকুঙ্গি মা বদী - স্টিকেহ গুণ্ডম হাম বন্দজুস
বেখুদী।

অর্থাৎ, ফকির বা সাধক মূলত তারা, যারা নিজেকে খোদার জাতে “ফানা” বা বিলীন করে “বাকা” বা স্থায়িত্ব লাভ করেন এবং খোদার খলিফা (প্রতিনিধি) ও রাসূল (দ.) এর নায়েব (স্থলাভিষিক্ত) বনেছেন। এই ব্যক্তিবর্গ “আবে হায়াতের” মত। তাদের অনন্তকাল স্থায়ী জীবন কখনো “ফানা” (বিলীন) হওয়ার নয়। আল্লাহর বাণী “ফালা নুহয়িইয়ান্নাহ হায়াতান-তাইয়িবাতা” অর্থাৎ তাকে আমি নিশ্চয় পবিত্র জীবন দান করব- (সূরা নহল-৯৭) যা মৃত্যুর মলিনতা মুক্ত। এ সকল মহাত্মাগণের বৈশিষ্ট্য জগতের সাথে তাদের সম্পর্ক দেহ ও প্রাণের সম্পর্কের মত। তাঁরাই জগতের প্রাণ। প্রাণ না থাকলে দেহ কি কথা বলতে পারে? প্রাণহীন দেহ কি কোন কার্যের আশা করে?

অতএব অগ্নিশিখার দৃষ্টির কেন্দ্রস্থল যেমন লোহা তেমনি আল্লাহর তাজল্লীর দৃষ্টির কেন্দ্রস্থল গাউসে জমানের অন্তর রাজ্য, দেহরাজ্য নয়। জগত তাঁর দেহরাজ্য সদৃশ। জগতের অন্তর ও দেহগুলোর সম্পর্ক গাউসে জমানের দেহ ও আত্মা সদৃশ। অর্থাৎ জগতবাসী গাউসে জমানের দেহতুল্য এবং তাঁর প্রাণজগতের প্রাণতুল্য। অতএব এ বিষয়ে অনেক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ইচ্ছা করেছিলাম কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে “আওয়াম” বা সাধারণের জ্ঞানস্বল্পতা হেতু (হেদায়ত হতে) পা পিছলে না যায়। অন্যথায় আমার পুণ্য পাপে পরিণত হবে, বরং যা বর্ণনা করেছি এ সকল (আমার) বে খুদি (আত্মহারা) অবস্থায় হয়েছে।

চতুর্থ পরতু: ইলম বা জ্ঞানের প্রকার ভেদ ও আলেম বা জ্ঞানীগণের পরিচয় : একথা অজানা নয় যে ইলম বা জ্ঞান এক মহামূল্যবান জাওহার বা রত্ন, ইলম বা জ্ঞান ইহকাল ও পরকালের আলেম বা জ্ঞানী পরম বন্ধু শতেক আফসোস, দুর্ভাগ্য যে আরবী জ্ঞান রবি ও ফার্সি জ্ঞান শশী তো অন্তমিত হয়ে গেছে উর্দু জ্ঞানের যেটুকু বাকি আছে তাও প্রায় ডুবস্তাবস্থায় কিছু দিনের মধ্যে এই কিছাও শেষ হয়ে যাবে। ওলামায়ে হক্কানী, ফোজালায়ে রাববানীগণ যাঁরা ছিলেন প্রায় তো চলেই গেলেন। এছাড়া অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত অজ্ঞানীরা আপন ভাবনায় কামেল বলে রয়েছে। পড়া নাই, লেখা নাই নামে মোঃ ফাজেল।

কবিতার ভাবার্থ:

এই যুগের এমন অবস্থা যে, জাহেল বা মূর্খরা জ্ঞানীগুণী নামে

পরিচিতি পাচ্ছে ও জহল বা মূর্খতাই জ্ঞান নামে প্রচলিত। এ যেন মূর্তির মাথায় সোলায়মানি রাজ মুকুট। এই যুগে প্রাণের বদ্লায় হলেও তা ত্রয় করছে মূর্খতার উন্মুক্ত বাজার হতে। মূর্খরা সোনার চামচ দিয়ে মিষ্টি মুখ করছে। অতি দুঃখে জ্ঞানীরা হীয়ার খুন পান করছে। পজিক্রাজের ঘাড়ে তীরবিদ্ধ আর গাধার গলায় সোনার হার শোভা পাচ্ছে।

কিছু লোক সামান্য উর্দু ফার্সি জানা হাদিস তাফসির জ্ঞানহীন দ্বীন ও আখিরাতে বেখবর (উদাসিন) খোদা-রাসূলের সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন, অথচ নিজেরা নিজেদেরকে যুগের বায়েজিদ বোস্তামী ও জোনায়েদ বোগদাদী হিসেবে জাহির করে। “আওয়ামুকাল আন'আম” পশু সদৃশ্য আওয়াম সমাজে নিজেদেরকে খোদার খলিফা ও নবীর নায়েব বা নায়েবে রাসূল হিসেবে জাহির করার অপচেষ্টা করে। আল্লাহ আকবর (আল্লাহ মহান) এরা এমন লোক যারা মানবরূপ শরতান স্বভাবী। তাদের নায়েবে রাসূল বলা বা ওয়ারেসে আম্বিয়া বলা গুণাহের বোৰা অহেতুক নিজেই নিজের কাঁধে নেওয়া। বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (দ.)-এর প্রতি অপবাদ দেওয়া ছাড়া কিছুই নয়। “মায়ায়াল্লাহ মিন জালিক” (আল্লাহ এ থেকে রক্ষা করুন)। রাসূল (দ.) ইরশাদ করেছেন, “আমার উম্মতের উপর এমন এক জামানা আসবে যে যুগের আলেমদের অন্তর হিংস্র বাঘের মতো হবে তাদের কথাবার্তা হবে নবীদের মতো এবং কর্ম হবে ফেরাউনের মতো, আমি তাদের প্রতি অসম্পৃষ্ট ও তারা আমা হতে অনেক দূরে।” তাদের আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতা হেতু সারা জগতকে পথভ্রষ্টতার কূপে নিপাতিত করতে চাচ্ছে। নিজেরা মূর্খতার চাদর আবৃতাবস্থায় রয়েও অন্যদের পথ প্রদর্শক সেজে বসেছে এবং সমগ্র জগতবাসীকে ফয়জ রহমতের বৃষ্টি হতে বক্ষিত রেখেছে। খোদা রাসূলের ভয়ভীতিহারা, কোরআন হাদিসের জ্ঞানশূন্য, ছোট মুখে যেমন তেমন বড় বড় কথা বলে। ঐ সকল নামধারী আলেমদের চিহ্ন, পরিচিতির ব্যাপারে কী তোমার দ্বিধাদ্বন্দ্ব আছে? তাদের পরিচয় এই যে, দুই দিনের এই দুনিয়ার জন্য নিজের দ্বীনকে বিনষ্ট করে, সত্য মিথ্যার কোন পার্থক্য করে না, হালাল হারামের মধ্যে বাছবিচার করেনা। তুচ্ছ দুনিয়ার অল্প গু-গোবরের জন্য কোন না কোন ব্যক্তির কাছে গিয়ে কাকুতি, মিনতি, তোষামদি করে চৌধুরী, মুঙ্গি সাহেবে সম্মোধনে “কুকুর মাছি”র মত লুটোপুটো করে করজোড়ে। যেন “আদ্দুনিয়ায়ু জিফাতুন তালিবুহা কুলবুন” অর্থ: দুনিয়া এক মৃত ইহার অব্বেষণকারী কুকুর। কেবল লালসার বিজয়কামী এই দুনিয়াদার কুকুরগুলো ভাল কথা বলতে পারেনা। অর্থাৎ দুনিয়ার গু-গোবর হারানোর ভয়ে ‘হক কথা’ বলে না, যদিও সামান্য ভাল কথা বা নছিহত অপরকে করে তাও আবার নিজে মান্য করেনা। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন : তোমরা কী মানুষকে ভাল কাজের নির্দেশ দাও

এবং নিজেরা নিজেদেরকে ভুলে যাও (সূরা বাকারা : ৪৪) অর্থাৎ অন্যকে নসিহত করে নিজে পালন করে না।
ওয়াজ করে বটে তবে নিজের নাই আমল
পরকে নজরবন্দি করার ফন্দি এ শয়তানের দল।
মানুষকে নিজেদের ধোকার ফাঁদে আটকানোর জন্য
নিজেদেরকে মুভাকি, পরহেজগার, সুফি সাহেবে হিসেবে
দেখায়। এ সকল আলেম আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (দ.) এর
দুশ্মন, ইসলামের ভিত্তি উৎপাটনকারী, দীন ও ঈমানকে সমূলে
ধ্বংসকারী, মূলত মানবরূপে শয়তান, “নায়েবে রাসূল” তো
নয়-ই বরং নায়েবে শয়তান, এ জমানায় নমরাংদের খলিফা ও
ফেরাউনের নায়েব (প্রতিনিধি)।

কথিত আছে যে, একবার কোন এক স্বচ্ছ অন্তরসম্পন্ন বুজুর্গ
ব্যক্তি অভিশপ্ত শয়তানকে অলস বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা
করলেন, হে মালাউন তোমার কর্ম তো খোদার বান্দাদেরকে
নিজের ধোকার জালে বন্দি করা, তবে তা না করে বেকার বসে
আছ কেন? অভিশপ্ত শয়তান উত্তর দিল, হজুর এই দুর্বল বৃক্ষের
অনেক খলিফা (প্রতিনিধি) আছে, যখন হতে তারা দুনিয়ায়
আত্মপ্রকাশ করল তখন আমি আমার কর্ম হতে অবসর
নিয়েছি। বুজুর্গ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার খলিফা বা শিষ্য
কারা? সে বলল ঐ দুনিয়াদার “ওলামা” ও আখেরী জমানার
“ফাজেল” বা শিক্ষিতরা, যারা দুনিয়ার মোহে আখেরাতকে
ডুবিয়ে দেয় এবং খোদা রাসূলের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভয় হয়ে যায়।
নাউজুবিল্লাহ! এ সকল আলেমদের নিষ্ফল ওয়াজ নসিহত শুনা
সম্পূর্ণ হারাম, যা “তরফদারী” বা পক্ষপাতদুষ্ট ও
“নফসানিয়ত” প্রবৃত্তি খাহেশাতে পূর্ণ। আর তা আমল করা
তো নেহায়েত গোমরাহী (পথভ্রষ্টতা), আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের
অসন্তুষ্টির কারণ। মুসলমান ভাইগণকে আল্লাহ এই বিপদ হতে
রক্ষা করুন। আমিন!

মসনবী

রংটি আর রংজির নেশায় কেন দ্বারে দ্বার
ইজ্জত সম্মান বিনষ্ট করছে তোমার!
নির্জনবাস কর ত্যাগি ধনবানের পাশ
ক্ষতি কিছু নাহি তাতে বিনে লাভের আশ।
কারুনের ধনকূপ দিলেও হে নির্ভিক
কখনো যেওনা তুমি দুনিয়াদারের দিক।
উপবাসে প্রাণ যদি দেহ ছেড়েও যায়
করজোড় না হইও মাছির উপায়।
প্রয়োজনে শান্ত হও খেয়ে বিরোচন,
ভবতরে পেরেশানী ভোগ করোনা কখন।
বসে থাক নির্জনে অল্পে তুষ্টির পার,
না হয় লজ্জন হতে পারে নির্দেশ খোদার।
লাথি মার কায়কাউছের রাজ সিংহাসন

তবু নিজ সম্ম যেন রহে সংরক্ষণ।
ধন ঐশ্বর্যের ভাণ্ড তব হলে হস্তগত
কি ফল হবে তাতে না থাকলে বীরত্ব।
দুনিয়ার মাল ধনের ছাড় মুহাবত
ধন লোভে না হও হিয়ার খুন পানে রত।
সোনা চাঁদির লাগি যে হারাবে সম্মান,
ঐসব কুকুরকে তবে গরু গাধা যান।
তাকওয়া জোহদী এ নয় যে, আত্মপ্রদর্শন
দরবেশীয় পোশাকে বসে তসবিহ পড়ন।
জুব্বা, পাগড়ী মিসোয়াক তপমালা ভবে
ঢীল পাক না হলে যে সব রিয়া হবে।
বাজে লোকের আড়তাতে করিয়ে গমন
নিজের ভাব দেখায় নির্লোভ সাধুর মতন।
প্রতারণার ফাঁদে ফেলতে ডাকাতের মত
নিজেরে “শেখে যমান” বলে দেখায় কত!
এই ছল চাতুরী যত অকর্মা অন্তরে,
প্রতি দমে যোগায় শয়তান দ্বীলে আসন করে।
নিজের বিচার নিজের কর হে দাগাবাজ নাদান
দ্বীলে রাখে প্রতারণা বোগলে কোরআন।
শয়তানের সাথে তোমার বদ্ধুত্ত অটল
সত্যের পথে কবে তুমি ছিলে অবিচল।
পাগড়ি ও মুখের দাঁড়ি তব প্রতিবন্ধক নয়
ভব মোহ পৈতার মত সদা সাথে রয়।
লোক দেখাতে এবাদত আর এতায়াত সব কর
খোদার খাতিরে কভু সিজদায় কি পর?
তোমায় যেনো লোকে আল্লাহওয়ালা জানে সার
সেজেছ পৃণ্যবান মোভাকী ও পরহেজগার।
হস্ত তোমার প্রসারিত হতে ধনবান
খোদার ইবাদত করেও ফের লও প্রতিদান।
এক অন্তর তাতে আবার আকাঙ্ক্ষা হাজার
চরকি সম দীলে শত পত্তি বাঁধা তার।
ধোকা ঘৃণা অহংকারে দীল রয় সজ্জিত
ধূর্তামি আর অপবিত্রতায় থাকে মুখরিত।
দণ্ডভরে সর্বদিকে করে দৃষ্টিপাত
ভাবছ নিজেই সর্বজ্ঞানী নিজেই অভিজাত।
ভূত বানাও, পূজাও কর নিজেই ভূত পূজারী
আজরের ভূত দেখে তব দীল হল নিন্দাকারী।
কুল মানের অহংকারে কেন ফুঁসি আছ
হে বেয়াদব! এক্ষণে দাঙ্গিকের পথ ছাড়
খোদা হতে মুখ ফিরিয়ে রইলে বে খবর
নিজের ক্ষতি কর নিজে ছেড়ে খোদার ডর।

(চলবে)

প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি এবং সুফিবাদ

● হাসনাত রেজা ●

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে হিসেব করলে ১ম শ্রেণি থেকে পোস্ট গ্রাজুয়েশন, ২৩ বছরের সময়কে দেখতে পাই। যেখানে শিক্ষা পাই শুধুমাত্র চাহিদার। হিসেবের, অংকের, সুদের। জাগতিক শিক্ষার বিরুদ্ধে বলছি না। কিন্তু এ শিক্ষা শুধু দুনিয়াবি দিকেই ধাবিত করে। সর্বোচ্চ শিক্ষায় সভ্য নাগরিক হয়েও কেনো মানুষ অপকর্মে লিঙ্গ হয়।

মূলত সে শিক্ষায় অভাব থেকে যায় মনুষ্যত্ববোধের। সৃষ্টিপ্রেমের শূন্যতা, প্রকৃতিপ্রেমের শূন্যতা। মনুষ্যত্ব হলো আত্মশিক্ষা, আত্মার শিক্ষা। নিজেকে চেনা। এটাই মানুষের শাশ্বত শিক্ষা। নবী কারিম দ.দীর্ঘ তেইশ বছরের ধ্যানমগ্নতার মাধ্যমে আত্মশিক্ষার সে উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন।

আত্মশিক্ষায় আমাদের মনোযোগ কম। বা নেই বললেও চলে। কারণ অতি পার্থিব চিন্তা। পাওয়া না পাওয়ার দর কষাকষি। না পাওয়া তৈরি করে হতাশ। আল্লাহর উপর ভরসা নড়বড়ে হয়ে যায় হতাশ ব্যক্তির। তখনই সৃষ্টি হয় শিরকের।

পার্থিব ভোগবাদ থেকে মুক্তি পেলেই নফসে ইনসান নিষ্ক্রিয় হয়। এবং কুলব বা বোধ জেগে উঠে। এ বিষয়টি আত্মধ্যান এবং খোদায়ী প্রেমের সংযোগের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। আত্মশিক্ষার সূচনা হয়।

আমাদের শৈশব চিন্তা করলে কতই না খুশি হই, কেঁদেও ফেলি। কারণ দিনগুলো ছিল অনিন্দ্য সুন্দর। শুক্রবারে থাকতো সুন্দর আমেজ। শবে কদর, শবে মেরাজ, শবে বরাতে দলবেঁধে যেতাম আউলিয়াগণের দরগায়। আতর, সুরমা, চারিদিকে মানুষের ভক্তি প্রেম। জাতি কুল নির্বিশেষে এক স্বর্গীয় প্রেমের আমেজ। সঙ্গে হলেই দরঢ ছিলো বাধ্যতামূলক। বড়দের সালাম দেয়া ছিল আদব, কদম্বুচি ছিল আদব। আমরা দেখে দেখে একদিন নিশ্চয়ই ভেবেছি- কি অপরূপ খোদা! কি অপরূপ সৃষ্টি! কি সুন্দর ভাতৃত্ব! কতো শাশ্বত এই প্রেম!

আজ যেন শেকলে বন্দী সেসব দিন! যে শেকলে বাঁধা পড়েছে সহজিয়া দর্শন! বর্তমানের শিশু থেকে কিশোর, যে বয়সটাই তাঁদের আত্মবোধ শিক্ষা সূচনা হবার মোক্ষম সময়, তারা কি

সেই সুযোগ পাচ্ছে, আছে? নেই। নানান জটিল ইস্যু, জাগতিক বিষয় তাদের সামনেই ঘটে চলেছে। বিতর্কিত প্রশ্নই তৈরি করে চলে তাদের মননে। সহজ স্বচ্ছ কোনো ছোঁয়া নেই। এভাবেই বেড়ে উঠে প্রজন্ম।

এখানেই শুরু হয়েছে প্রতিযোগিতা। প্রতিষ্ঠিত হবার, জাহির করার, শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করার প্রতিযোগিতা। অথচ মানুষ তো তখনই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিল, যেদিন প্রথম সৃষ্টি আদমের পায়ে শির ঝুঁকিয়েছিল অগণিত ফেরেশ্তা। তাহলে, আজ কোন বিষয়ের কারণে আমাদের বোধ- আবেগ, সিম্প্যাথি পর্যন্ত এসে থেমে যায়? ভাবনায় কেনো নিয়ে যায় না?

এ সব জাগতিক বিষয় থেকে পরিশুল্কি লাভের উপায় হল সুফিবাদ। যা সহজিয়া সৌজন্যবোধ। সার্বজনীন সংহতির ডাক দেয়। সুস্থ মনন এবং অ্যাচিত ইহজাগতিক মোহমুক্তির মাধ্যমে নিজের সাথে পরম শক্তির সংযোগ স্থাপন করায় সহায়ক হয়।

সুফিবাদ: যখন মানুষ চাহিদা, লোভ, লালসা, ক্ষমতা প্রভৃতির কাছে দাসত্ব বরণ করে আর তারা ভাবে তারা সম্মানের স্থানে আছেন! তখনই অবলুপ্তি ঘটে দর্শনের তথা ধর্মের। তখনই হয় মানুষ অধর্মী। আর এসকল চাহিদার সাথে যুদ্ধ করে সহজ-সরল এবং সত্য পথকে বেছে নেয়ার যে দর্শন, তাকে প্রায়ই মানুষ তাসাওউফ বা সুফিবাদ হিসেবে জেনে থাকবেন। যার মূল এবং একমাত্র উদ্দেশ্য সমস্ত কামনা বাসনার মোহ মুক্তি ঘটিয়ে, মনে সৃষ্টিকর্তা এবং রাসূলে খোদা দ.এঁর প্রেম জগ্নিত করা। হক্কুল্লাহ বা খোদার উপাসনা এবং সার্বক্ষণিক সৃষ্টির সেবায় বা হক্কুল ইবাদে নিয়োজিত রাখার বাসনা তৈরি করা। মানুষের ভেতরের জড়তা কাটিয়ে নিজেকে চেনা এবং জানার মাধ্যমে প্রেমময় বিশ্ব গড়ে তোলার অনন্য প্রত্যয়ের নামই তাসাওউফ। হলফ করে বলা যায়, বর্তমান বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় তাসাওউফের গুরুত্ব সর্বাঞ্চে।

মানুষ অধর্মের পথে তখনই হাঁটে যখন তার জীবনযাত্রায় কোনো শাশ্বত দর্শন অনুপস্থিত থাকে। সেভাবে বলা যায় ধারণযোগ্য দর্শনের অনুপস্থিতিই অধর্ম। মানুষকে জাগতিক এবং পারলৌকিকতার পথে সহজ সুন্দর করতে প্রয়োজন হয়।

সত্য দর্শনের। এবং সেই দর্শনকে ধারণ করতে পারলেই মানুষের ধর্ম প্রকাশ পায়।

বৈশ্বিক চিত্রে যে দৃশ্য অবতারণ ঘটছে প্রতিনিয়ত তাতে দেখা যায় জাগতিক চাহিদার নিপীড়নে মানুষ সংঘাতে লিপ্ত। এর অন্যতম কারণ অন্তর্নিহিত জ্ঞানের অভাব। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে ক্ষমতার লোভে দেয়াল তুলে দিচ্ছে মানুষ অনায়াসেই। এর একমাত্র কারণ অতি দুনিয়াবি চিন্তা।

এ পরিস্থিতি থেকে মুক্তির জন্যে প্রেমের মাধ্যমে সৃষ্টি ও মানবকল্যাণে নিজেকে নিযুক্ত রেখে, মহান পরমের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ স্থাপনের অতীব প্রয়োজন। যা তাসাওউফপন্থীদের একমাত্র উদ্দেশ্য। সর্দারে কায়েনাত, আল্লাহর পেয়ারা হাবীব হ্যরত মুহাম্মদ (দ.) নিজেই তাসাওউফের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সেই থেকে আজ পর্যন্ত প্রথিবীর সমস্ত স্থানেই তাসাওউফ বা সুফিবাদকে ধারণ করার চর্চা চালিয়ে যাচ্ছে অগণিত মানুষ। তাসাওউফ বা সুফি দর্শনকে সবিস্তারে জেনে ধারণ করার নিমিত্তে বিশ্বাসীগণ বিভিন্ন পথ (তুরিকা)’র নীতিমালা গ্রহণ করে এবং নীরব ধ্যানমগ্নতার মাধ্যমে নিজেদের ভিতর ঐশ্বরিক প্রজ্ঞার প্রকাশ ঘটান। একটু দৃষ্টি বুলালে দেখা যায় সারাবিশ্বের প্রায়ই প্রতিটি স্থানেই স্বমহিমায় বৃদ্ধি পাচ্ছে সুফিবাদ বা তাসাওউফে আগ্রহীদের সংখ্যা। নির্বিলাস, নির্মোহ খোদাপ্রেম লালন এবং সৃষ্টির সেবায় নিয়োজিত করে চলেছে নিজেদের তারা। এখানে কোনো ধর্ম-জাতি-বর্ণের আলাদাকরণ নেই বরং মিলেমিশে ভাত্তপ্রেমের এক অনন্য দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে চলেছে তাসাওউফ দর্শন।

মাইজভাণ্ডারী সুফি দর্শন: আল্লাহ হাবীব, কায়েনাতের সর্দার, রাসূল কারীম (দ.) এর মাধ্যমে নবুয়ত যুগের পরিসমাপ্তির পর, কালের হোতে সহজিয়া মানব দর্শন ইসলামের রীতি নীতি এবং আভ্যন্তরীন বিষয়গুলো নিয়ে নানান মতামতের সৃষ্টি হয়। যা সরলপ্রাণ বিশ্বাসীদের অন্তরে দ্বিধা এবং বিভাসির সৃষ্টি করে। ধীরে ধীরে ফ্যাকাশে হতে থাকে ইসলামের সৌন্দর্য।

গুরুবাঁধা আচার আনুষ্ঠানিকতার নামই হয়ে যায় ইসলাম। এই উদ্বিগ্নতার সময়ে মহান রাবুল আলামিন গাউসুল আয়ম হ্যরত সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী ক. কে মানবজীবনের সহজিয়া দর্শন ইসলামের পুনরুজ্জীবিতকারী বা ‘মুহিউদ্দিন’ উপাধি দিয়ে ধরায় প্রেরণ করেন। একই সাথে তিনি প্রথম গাউসুল

আয়ম ও কুতুবুল আকতাবরূপে প্রকাশ্য হন। তিনি হলেন খোদাপ্রদত্ত বেলায়তী ওজমার অধিকারী।

নবুয়তযুগের সমাপ্তির প্রায় পাঁচশত বছরের সময়ের ব্যবধানে ধর্মীয় ও মানবিক অনুশাসনে যেরূপ বিরোধিতার প্রচলন ঘটে তা প্রথিবীর আনাচ কানাচে থাকা সরল বিশ্বাসীদের অন্তরে ধর্মবিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি করে। এই সময় প্রখ্যাত ওলী, সুলতানুল হিন্দ গরীবে নেওয়াজ খাজা মঙ্গলউদ্দিন চিশ্তী ক., গাউসুল আয়ম আবদুল কাদের জিলানী ক. এর সমসাময়িককালে ফয়েজপ্রাপ্ত হয়ে সাব কন্টিনেন্টাল এলাকা (পাক-ভারত উপমহাদেশে) যুগের সংক্ষারক ও তাওহীদ প্রচারক হিসেবে আবির্ভূত হন। এছাড়াও এই সময়ে আরো অগুণিত ‘উলিল আমর’ (ওলীগণ যুগসংক্ষারের কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। যাঁরা গাউসুল আয়ম হ্যরত আবদুল কাদের জিলানী (ক.) এর ফয়ুজাত ছিলেন। সেসময়ে সামাজিক অবস্থার অবক্ষয় হতে থাকা মানবকুলের মধ্যে শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার নিমিত্তে ওলীগণ ইসলামী শরীয়তের কঠোর অনুশাসনকে বলবৎ রাখার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং শরীয়তী বিধান মোতাবেক হেদায়েত কার্য পরিচালনা করেন।

গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী হ্যরত ক্রিবলা (ক.) এর নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত সংক্ষারযুগকে বেলায়তে মোত্লাকায়ে আহমদী (অর্গলমুক্ত প্রেমবাদ) যুগ বলা হয়। গাউসুল আয়ম হ্যরত আবদুল কাদের জিলানী (ক.) এর নেতৃত্বযুগের (বেলায়তে মোকাইয়্যাদা) অবসানের ছয়শত বছরের মধ্যেই আবারো অসহনশীল পর্যায়ে দুকে পড়ে মহাবিশ্ব। মূলত ইসলামী হৃকুমতের বিলুপ্তিজনিত কারণে যথাযথ উপায়-কৌশল-আচার ইত্যাদির বিষয়ে যথার্থজ্ঞান প্রসারণ থেমে যায় ফলে তৈরি হয় মতবিরোধ, বিশ্বঙ্খলার। ধ্বসে পড়ে মানবিক চিন্তার সুষম গতি।

নানান অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে মানুষ, জেঁকে বসে ধর্মীয় গোঁড়ামি। যা সুকৌশলে সৃষ্টি করা হয়েছিল। যাতে মানুষের সরল বিশ্বাসের উপর সহজেই প্রভাব ফেলতে পারে। পৌত্রলিকতা, বস্ত্রবাদ, মানুষের স্বকীয়ভাবকে পুরোপুরি পঞ্চগু করার মতো নানান ইজম বা মতবাদের উভব ঘটে। গ্রন্থপ্রেম থেকে বিচুত হ্বার এক নজীরবিহীন প্রতিযোগিতায় নামিয়ে দেয়া হয় সরলপ্রাণ মানুষদের, তাদেরই অজ্ঞানেই, অন্তরে প্রবেশ করানো হচ্ছিলো যাবতীয় চরিত্রবিধবৎসী মতবাদ যাতে

করে তারা সরে যায় এবং ক্ষমতায়ন ঘটতে পারে ধর্মপুঁজিবাদের। ফলে দারণভাবে নেতৃত্ব অবনতির শিকার হয় মানবসভ্যতা।

মানবসভ্যতার এমন অবক্ষয়ের ক্রান্তিতে, ক্ষমতা, জাগতিক মোহে আটকে পড়া মানুষ এবং সমাজের চিত্র পুনরায় সংক্ষারপূর্বক মানব সমাজকে যাবতীয় দুনিয়াবি মোহমুক্তি হতে সঠিক পথ প্রদানের জন্য বিশ্বাণকর্ত্ত্বের অধিকারী গাউসুল আয়ম রূপে হ্যরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাঙ্গারী (ক.) কেবলার আবির্ভাব ঘটে। তাঁর আবির্ভাবের মাধ্যমে বেলায়তে মোকাইয়্যাদা যুগের সমাপ্তি এবং বেলায়তে মোতলাকায়ে আহমদী বা তথাগত শৃঙ্খলমুক্ত ঐশ্বীপ্রেমবাদের যুগের আরম্ভ হয়। খোদায়ী প্রেমবাদের যুগ ধর্মজগতের ও সমাজজীবনের আবর্তন বিবর্তনমূলক শ্রেষ্ঠতম স্বাভাবিক ক্রিয়াবিশিষ্ট যুগ। সমস্ত জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির অন্তরে আত্মপোলন্ত্বির মাধ্যমে ঐশ্বরিক প্রজ্ঞার প্রজ্ঞলন ঘটানো হলো মাইজভাঙ্গারী দর্শন এর মূল নীতি। বলা বাহ্যিক, মাইজভাঙ্গারী দর্শন হচ্ছে এই অর্গলমুক্ত ঐশ্বী প্রেমবাদেরই ফলশ্রুতি।

সচরাচর অনেকেই ধারণা করেন যে মাইজভাঙ্গারী দর্শন একটি নব্য আবিষ্কার এবং প্রচলিত ইসলামী নীতি বিধানের সাথে সাজৰ্ঘিক, আদতে এমনটি আদৌ নয় বরং মাইজভাঙ্গারী দর্শন হলো আদি এবং আধুনিক ইসলামের মূল নির্যাস হতে সৃষ্টি দর্শন যা প্রথিবীর সামগ্রিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম। সুফি কবি কাজী নজরুল ইসলাম (রহ.) তাঁর কালজয়ী গানে বলেন ‘তোর প্রেম দিয়ে কর বিশ্ব নিখিল ইসলামে মুরিদ ‘অন্যদিকে জগত্বিদ্যাত সুফি আল্লামা রূমী বলছেন, ‘খোদা লাভের অজগ্র পথ রয়েছে, আমি তাঁর মধ্যে প্রেমকেই বেছে নিলাম ‘তেমনটি করে মাইজভাঙ্গারী দর্শন ঐশ্বীপ্রেম জাগ্রতকরণের দিকে মানুষকে ধাবিত করে, এতে করে মানুষ তাঁর নিজ শান-মান-মর্যাদা উপলক্ষ্মি করতে সক্ষম হয়। মানুষ যখন খোদায়ী প্রেমের গভীরতা খুঁজে পায় তখন তাঁর দ্বারা এমন কোনো কর্ম সংঘটিত হবার সম্ভাবনা নেই যা মানবচরিতের বহির্ভূত। কাজেই মাইজভাঙ্গারী দর্শন মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে যা সুফিবাদের মূল বিষয়বস্তু হয়ে থাকে। সুতরাং এখানে বিষয়টি পরিষ্কার যে মাইজভাঙ্গারী দর্শন কোনো মনগড়া দর্শন নয় এবং এটিই হলো সুফিবাদের চূড়ান্ত বিকশিত রূপ।

মাইজভাঙ্গারী সুফিবাদের মূল উদ্দেশ্য হল মহান খোদার দিদার লাভ করা এবং খোদার পথে নিজেকে উৎসর্গ করা। খোদার দিদার লাভ করতে হলে খোদার ভালবাসা ও সম্মতি লাভ করতে হবে এবং খোদার ভালবাসা ও সম্মতি লাভ করতে হলে প্রকৃত মুসলমান হতে হবে, কিংবা ইসলামী ভাবাদর্শে উল্লাস হতে হবে। একজন বিশ্বাসী হওয়া তখনি সম্ভব হয় যখন একত্র বিশ্বাসীর হৃদয় খোদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান (ইলম-ই-মারিফাত) লাভ করে এবং খোদার প্রতি তার পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করে।

মাইজভাঙ্গারী সুফি দর্শনের মূলনীতি ও শিক্ষা: বিশ্বাসীগণের অন্তরে খোদা ও রাসূলপ্রেম প্রজ্ঞলন এবং সৃষ্টিকর্তা নির্দেশিত শর্ত ও কর্মসমূহকে কিভাবে সম্পাদন করা যায় সেদিকেই মাইজভাঙ্গারী দর্শন তাঁর স্বতন্ত্র নীতিসমূহ প্রকাশ করে। যে নিয়ম-বিধান পরিপূর্ণভাবে মেনে চলার মাধ্যমে অন্তরে রাসূল প্রেম এবং খোদার সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ সম্ভব হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যে মানুষ সর্বদা নিজের মধ্যে সৃষ্টিকর্তার প্রকাশের ভাব বুঝতে পারে তাঁর দ্বারা অনৈতিক বা জীবনযাত্রায় বিরূপ প্রভাব ফেলে এমন কাজ কখনোই করা সম্ভব হয়ে ওঠেনা, আর মাইজভাঙ্গারী সুফিনীতি মানুষের মধ্যে সেটাকেই ধারণ করতে সহায়তা করে, যা স্বয়ং রাসূলের নির্দেশ। হাবিবে খোদা মাহবুবে দোজাহাঁ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (দ.) বলেন, ‘শ্রেষ্ঠ আমল হলো আল্লাহর জন্য ভালোবাসা, আল্লাহর জন্য দৈর্ঘ্য করা।’ (বুখারি ও মুসলিম)।

নিচে সংক্ষেপে মাইজভাঙ্গারী সুফি দর্শনের মূলনীতি (উসুলে সাব'আ) এবং শিক্ষা তুলে ধরা হলোঃ

সম্প্রকার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বা উসুলে সাব'আ: রিপুর ত্রিবিধ বিনাশ এবং চতুর্বিধ মৃত্যুর সমষ্টিই হচ্ছে সম্প্রকার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। নফসে ইনছানীর কুপ্রবৃত্তি বন্ধ করে রুহে ইনসানীর সুপ্রবৃত্তি জাগ্রত করার জন্য হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাঙ্গারী (ক.) সর্ব সাধারণের উপকারার্থে, নির্বিশেষ সহজসাধ্য উপায় হিসাবে সম্প্রকার পদ্ধতিকে প্রাধান্য প্রদান করেছেন। এই সম্প্রকার সকল তৃরীকত পন্থীর নিকট আদৃত ও স্বীকৃত হয়ে আসছে। নিম্নে মানবজাতির আত্মশুদ্ধির জন্য সম্প্রকার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণিত হল:

ত্রিবিধ রিপুর বিনাশ বা ফানায়ে ছালাছা

১. ফানা আনিল খাল্ক (আত্মনিভুব হওয়া): ফানা আনিল খাল্ক বা কারও কাছ থেকে কোনোরূপ উপকারের প্রত্যাশা না করা কিংবা এরূপ কোন কামনা মনের মধ্যে পোষণ না করা। প্রকৃতপক্ষে কারো কাছে কিছু চাওয়া বা প্রত্যাশা করা ভিক্ষার

মত হীন কাজ। পরমুখাপেক্ষিতা মানুষকে পঙ্গু করে দেয়। মানুষের গ্রন্থি প্রদত্ত সহজাত শক্তি বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করে। সুতরাং পরমুখাপেক্ষিতা বর্জন মানুষকে স্বনিভুত হতে সাহায্য করে। ব্যক্তি কিংবা রাষ্ট্রীয় জীবনে উন্নতির জন্য আত্মনির্ভরশীলতার অন্য কোন বিকল্প নাই।

২. ফানা আনিল হাওয়া (অনর্থ পরিহার করা): ফানা আনিল হাওয়া বা যা না হলেও চলে সেরূপ কাজকর্ম ও কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা। পবিত্র কোরআনের মতে “যে কেউ অনর্থ পরিহার করে তার নিশ্চিত স্বর্গবাস।” অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষাই হচ্ছে মানুষের মৌলিক চাহিদা। এর অতিরিক্ত ভোগ-লালসা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে আত্মাতী সংঘর্ষ সৃষ্টি করছে। তাই মাইজভাণ্ডারী সুফি নীতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে চাহিদার অতিরিক্ত সব অনর্থ পরিহার করে শোষণহীন স্থিতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

৩. ফানা আনিল ইরাদা (খোদার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয়া): ফানা আনিল ইরাদা বা খোদার ইচ্ছা শক্তিকেই প্রাধান্য দেয়া এবং নিজের ইচ্ছা বা বাসনাকে খোদার ইচ্ছার নিকট বিলীন করা যার ফলে সুফি মতে তছলিম ও রজা হাচেল হয়। দুঃখ-কষ্ট ও বিপদে হতবুদ্ধি হওয়া কিংবা হতাশাগ্রস্ত হয়ে কর্মবিমুখ হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ। হতাশা মানুষকে পঙ্গু করে দেয়, চরম ঘৃণিত পাপকার্য আত্মহত্যার দিকে মানুষকে ঠেলে দেয়। এতে সমস্যার কোন সমাধান হয় না। তাই সর্ব অবস্থায় খোদার ইচ্ছা শক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে এবং খোদার ইচ্ছাকে মনে নিয়ে চরম ধৈর্য ধারণ করাই হচ্ছে প্রকৃত দৈমানদারের লক্ষণ।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে, “নিশ্চয়ই আল্লাহতায়লা ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।”

মউতে আরবা বা চতুর্বিধ মৃত্যু:

১. মউতে আবয়জ বা সাদামৃত্যু: নিজের মধ্যে কামনার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার জন্য উপবাস ও সংযমের অভ্যাস করা। এর ফলে মনে আলো বা উজ্জ্বলতা দেখা দেয়। উদাহরণ স্বরূপ, রমজানের রোজা বা নফল রোজা প্রভৃতি।

২. মউতে আসওয়াদ বা কালো মৃত্যু: সমালোচনাকারীর সমালোচনায়, শক্রতায় এবং নিন্দাকের নিন্দায় রাগান্বিত না হয়ে ধীর-স্থিরভাবে নিজের মধ্যে সমালোচনার, নিন্দা কিংবা শক্রতার কারণ খুঁজে উহা সংশোধনের প্রচেষ্টা চালানোর গুণ অর্জন করাই হচ্ছে কালো মৃত্যু। নিজের মধ্যে সমালোচনার কারণ খুঁজে পেলে মানুষ দোষ-ক্রটি সংশোধনের সুযোগ পায় এবং খোদার কাছে অনুত্পন্ন হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারে। যদি আত্মবিশ্লেষণের পর নিজেকে নির্দোষ মনে হয় তবে

আল্লাহতায়লার নিকট শোকরিয়া আদায়ের মনোবল প্রাপ্ত হয়ে নিজের ব্যক্তিতে একজন মানুষ বিরাট শক্তির সমাবেশ দেখতে পায়। অহেতুক সমালোচনায় ধৈর্য ধারণ করলে সমালোচনাকারী দুর্বল হয়ে যায় এবং শক্রুতা অনেক সময় বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং সমালোচনায় ধৈর্যধারণ করে আত্মবিশ্লেষণের নামই কালো মৃত্যু।

৩) মউতে আহমর বা লাল মৃত্যু: কামভাব ও লালসা থেকে মুক্তিতে হাচেল হয়। কামভাব ও লালসা মানুষকে পাপের পথে ঠেলে দেয়। ধৰ্ষণ, গুম, হত্যা প্রভৃতি লালসার কারণেই সংঘটিত হয়ে থাকে। কামভাব ও লালসাকে দমন কিংবা ধ্বংস করতে পারলে লাল মৃত্যুর গুণ অর্জিত হয় এবং দমনকারী ব্যক্তি অলীয়ে কামেলের পর্যায়ভুক্ত হন।

৪) মউতে আখজার বা সবুজ মৃত্যু: নির্বিলাস জীবনযাপনে অভ্যন্ত হলে সবুজ মৃত্যু হাচিল হয়। নির্বিলাস জীবনযাপনের ফলে মানব অন্তরে গ্রন্থার প্রেম-ভালবাসা ছাড়া অন্য কামনা থাকে না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সবকিছু বর্জন করলে নিজের ও সমাজের কল্যাণ সাধিত হয়। ইহা বেলায়তের খিজরীর অন্তর্গত।

‘দুনিয়া মুসাফিরের জায়গা, এইখানে আড়ম্বরের দরকার কি?’

- হ্যারত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)

পৃথিবীজুড়ে মানবজাতির পীড়াদায়ক সময় আমরা দেখতে পাচ্ছি, যেখানে মানুষ ছুটছে শুধুমাত্র জাগতিক চাহিদার বলয়ের দিকে আর ধর্মদর্শন হয়েছে শুধুমাত্র আচার-রীতি। এই অসময়েও লক্ষ্য করা যায় নতুন প্রাণের সঞ্চার হতে চলেছে, ধীরে ঠাঁই করে নিচে বিশ্বজাহানে সৃষ্টির আলা মকামের সমগ্রতায়, পৌছে যাচ্ছে আলো।

একদিন এই আলো পূর্ণাঙ্গ বিস্ফোরিত হবে প্রত্যেক কোণ থেকে, প্রত্যেক ঘর এমনকি প্রত্যেক প্রাণ থেকে বেরিয়ে আসবে ঐশীপ্রেমের গান, সংঘাত ঘুচে যাবে, বেয়োনেট হারিয়ে যাবে, অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হবে উসুলে সাবআ - চতুর্বিধ মৃত্যু ঘটিয়ে দীপ্ততায় প্রেমময় হয়ে আলো ছড়াতে যাচ্ছে পুরো বিশ্বের তরুণ সমাজ।

এই একবিংশ শতাব্দী নিয়ে কতশত শব্দ আর গানের ভুবন ঘুরেছি আমরা। এই শতাব্দীই হতে যাচ্ছে বিশ্ব মানব প্রেম ধারণ করার সময়। মানুষে মানুষে হানাহানি করে আসবে, আত্মাপলক্ষির চরম উৎকর্ষতা পরিলক্ষিত হবে। আভাস আসছে। প্রেমকে ধারণ করে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হবে শান্তি ও মানবতা। এই একবিংশ শতাব্দী। আমিন!

ফতুহাতে মঙ্গিয়া

বিশ্ব বিখ্যাত দার্শনিক এবং তাসাওউফ ব্যক্তিত্ব শায়খুল আকবর হযরত মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবীর (ক.) অমর গ্রন্থ ‘ফতুহাতে মঙ্গিয়া’। তাসাওউফ সম্পর্কিত সুউচ্চমানের এ গ্রন্থ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ আকারে প্রকাশিত হলেও বাংলা ভাষায় এ সম্পর্কিত অনুবাদের অগ্রগতি অতি সীমিত। মহান সুষ্ঠা এবং প্রতিপালক আল্লাহ্ রাবুল আলামীনের সর্ববিষয়ে একক এবং অবিনশ্বর আধিপত্য তথা ‘ওয়াহ্দাতুল ওজুদ’ বিষয়ে হযরত মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবীর ধারণা সম্বলিত ফতুহাতে মঙ্গিয়া বাংলা ভাষায় অনুবাদ আকারে পাঠক সমিষ্টে পেশ করার উদ্যোগ আলোকধারা কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছেন। আলোকধারা জুলাই-’২১ সংখ্যায় অনুবাদের প্রথম কিন্তি ছাপানো হলো। অনুবাদ করেছেন আবরার ইবনে সেলিম ইবনে আলী – সম্পাদক

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সকল প্রশংসা ঈ আল্লাহ্ তায়ালার যিনি সমস্ত বস্তুকে অস্তিত্বের মধ্যে আনলেন এবং তা আবার বিধ্বংস করে দিলেন এবং সকল বস্তুর “অজুদ” বা অস্তিত্ব নিজ হৃকুমের আওতায় সীমাবদ্ধ করে দিলেন। যেন সকল বস্তুর নতুনত্ব ও পৌরাণিক রহস্য তাঁর প্রাচীনতার ভিত্তি সাব্যস্ত হয়ে যায় এবং আমি তাঁর শিখানো প্রকৃত প্রমাণকে সামনে রেখে তাঁর প্রাচীনতার সত্যতার উপর অবগতি অর্জন করেছি।

অতএব আল্লাহ্ সোবহানাহু সবকিছু সংগঠিত করেন ও নিজেই প্রকাশমান হয়ে অপরাপর সকলকে প্রকাশ-বিকাশ করলেন এবং তিনি গুণ্ঠ নন, যদি গুণ্ঠ হতেন তবে অন্যান্যকেও গোপন রাখতেন।

“প্রথম নামে” বান্দার জাত (সভা) কে অজুদের / অস্তিত্বের / প্রকাশ দিলেন এবং তা প্রকাশ পেয়ে গেল। আর তার জন্য “শেষ নামে” বিনাশ ও হারিয়ে যাওয়ার ভবিতব্য বা নিয়ন্ত্রণ নির্ধারণ করে দিলেন। ইহা তার প্রথমেই স্থির করা ছিল।

যদি কাল ও সময়সীমা মূর্খ ও জ্ঞানী (সৃষ্টি) না হতো তবে কারো পক্ষে তাঁর আউয়াল, আখের, জাহের, বাতেনের অর্থ বুঝার জ্ঞান হতো না। যদি না তাঁর “আসমায়ে সিফাত” বা সুন্দর গুণবাচক নামাবলী সুউজ্জ্বল পত্রের উপর থাকে কিন্তু এর মধ্যে গন্তব্য স্তর রয়েছে এবং একথা ঈ সময় প্রকাশ পেয়েছে, যখন “ভুলুলে নাওয়জেল” বা আবৃতাবস্থায় প্রকাশের উসিলা বা মাধ্যম করা হয়েছিল।

অতঃএব, কেউ আবদুল হাকিম, আবদুল করিম নয়, না কেউ আবদুল গফুর, আবদুশ শকুর। এটা প্রত্যেক বান্দার এক একটি

নাম এবং এটাই তাঁর “রব” এবং এটাই খোদ্ এই নামের অজুদ (অস্তিত্ব) এবং কুলব।

ঈ সোবহানাহু তায়ালাই “আলীম” যিনি জাতি বা মূলগত নিজেই নিজেকে জানেন এবং অপরকে শিক্ষা দেন। অথবা যিনি জাতি বা মূলগতভাবে নিজেই “হাকেম” নিজেই হৃকুম দিলেন ও নিজেই হাকেম (হৃকুমদাতা) বানালেন। অথবা তিনি নিজেই “গালিব” (প্রভাবশালী) অন্যকেও গালিব (প্রভাবশালী) বানালেন।

তিনিই “কাদের” তিনিই “মোকাদ্দার” (ভাগ্যলিপি) বানালেন এবং “কাসব” (অর্জন) কে “তাকদির” (ভাগ্য) বানালেন না। তিনিই “বাকী” বা চিরস্থায়ী তাঁর সাথে স্থায়ীত্বের কোন সিফত কার্যম নাই।

মোশাহেদার সময় তিনি সামনাসামনি হওয়া থেকে পবিত্র বরং বান্দা ঈ পবিত্রতম স্তরে নৈতিক পবিত্রতার অধিকারী হয়ে যায়। এমন কখনো হয় না যে, আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালার সাদৃশ্য প্রতিপাদন সংযুক্ত হয়ে যায়।

নৈকট্যের এই স্তরে বান্দা হতে দিকসমূহ অপসারিত হয়ে যায় এবং তাঁর উপর দৃষ্টি স্থির হওয়া থেকে মনোযোগ বিনাশ হয়ে যায়।

আমি ঈ প্রশংসিত সভার (খোদার) এ ধরনের প্রশংসা বর্ণনা করছি যে, আল্লাহ্ সোবহানাহু তায়ালা নিজ গুণে গুণাবিত ও সুউচ্চ স্তরের এবং সুউচ্চ স্তর দানকারীও এবং নিজ জাতে বা সভাগত অত্যধিক “জলিলুল কদর” “আজিম” বা সু-মহান এবং “আজমত” বা শ্রেষ্ঠত্ব দানকারীও, কেননা তাঁর সামনে ইজত ও আজমতের পর্দাবৃত রয়েছে এবং তাঁর জাতের বা সভাগত পরিচিতি অর্জন করার দরজা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ।

যদি তিনি নিজের বান্দাগণকে ডাকেন, তাহলে তিনি নিজেই শ্রবণ করেন ও শ্রবণ করান। এখন বান্দা যদি তাঁর হৃকুমের তামিল করে তবে তিনি নিজেই “অনুগত” নিজেই অনগম্য। যখন আমাকে এই রহস্যে হতভম্ব করে দিল তখন আমি তুরিকার হৃকুম মোতাবেক “খলিফা” অর্থাৎ মানব কুলের জন্য এই শে’র পড়লাম।

“ইয়া রবে হক ওয়াল আবদে হক
ইয়া লাইতা শে’রী মিনাল মুকাল্লাফ
ইন কুলতা আব্দান ফাজালিকা মাইতুন
আউ কুলতা রাবু আন্না ইউকাল্লাফ।”

অর্থাৎ আল্লাহ সত্য, বান্দা সত্য, আমার এমন মনে হচ্ছে কে কষ্ট প্রাপ্ত! যদি তুমি বল বান্দা তবে সে তো মৃত্যুর অধীন, যদি বল “রব” তবে তিনি কিভাবে কষ্টপ্রাপ্ত হবেন!!

অতএব, ঐ জাতে মুকাদ্দাস/পবিত্র সত্তা যখন চান তখনই মাখলুক/সৃষ্টি হতে নিজের আনুগত্যতা প্রকাশ করিয়ে নেন এবং তাঁর “ওয়াজিবে মোতায়াইয়েনে হক” বা প্রতিনিধি নিয়োগ আবশ্যিকতায় তিনি সত্তাগতভাবে ন্যায়পরায়ণ যা সম্পূর্ণ আকৃতিমূক। যা নিজের শামিয়ানায় প্রতিভাত।

“খাবিয়াতোন আলা উরশিহা”

এবং তিনি নিজ ঘাক বাঁড়িয়ে (ধ্যানাবস্থায় নিম্নমুখী হয়ে) বসেছিলেন (কাহাফ : ৪২)

পাহাড়ের প্রতিধ্বনিতে আমার রহস্য নিহিত। ঐদিকে আমি ঐ ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করছি, যে ব্যক্তি হেদায়ত অর্জন করতে চায়, সে ঐ ব্যক্তির মতো যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, যার মধ্যে এই ধারণা রয়েছে “মুকাল্লাফ” বা “কষ্টপ্রাপ্ত” করে সৃজনের মধ্যে মারুদের নাম প্রকাশ পায় এবং “লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা”র মূল অস্তিত্বের প্রকৃত অবস্থা “অজুনে জাহের” বা অস্তিত্বের প্রকাশ্য রূপ।

অতএব, যদি তুমি জান্নাতকে কার্যের ফল মনে কর তবে তা অনুগ্রহ ও দয়া বলা হয়েছে যা তুমি জান।

একথা তোমার জানা আছে যে, তোমার সত্তাগত অবস্থাই হচ্ছে প্রদত্ত, জ্ঞানগত দিক থেকে তোমার নফসের মূল অবস্থা মাহজুব বা অব্যক্ত অতএব যখন তুমি “জাজা” বা ফলকে দেখতে চাও যেটা তোমার জন্য নয়, তবে তুমি নিজের আমলকে কিভাবে দেখবে?

অতঃপর তুমি বস্তুকে এবং ঐ বস্তুর স্রষ্টাকে ছাড়, রিজিকপ্রাপ্ত ও রিজিকদাতাকে ছাড়, এখন দেখ তিনিই (হক তায়ালা) মহানদাতা যাতে কোন বিষণ্ণতা আসে না। তিনি সুমহান বাদশাহ ও আপন বান্দাদের জন্য “লাতিফ ও খবির” বা অতিশয় অনুগ্রহপরায়ণ ও জ্ঞাত।

যিনি “লাইসা কা মিছলিহি শাইউন ওয়াহ্যাস সামিউন বাসির, কোন কিছুই তার অনুরূপ নয়। তিনি সব শুনেন ও সব দেখেন – (সূরা শুরা : ১১)।

দর্কন্দ ও সালাম ঐ জাতে পাকের উপর যিনি সৃষ্টি জগতের “রাজ” বা রহস্য এবং সৃজিতবস্তুসমূহ সৃষ্টির নোঙ্গা বা কেন্দ্রস্থল। তিনি সৃষ্টি জগতের কাম্য বস্তু “মতলুব” ও লক্ষ্যস্থল (সৈয়দ সাদেক)।

তিনি ঐ জাতে আকাদস যাঁর জন্য সাত আসমানের রাস্তা খুলে যায় এবং জাতে খোদা তাঁকে রাত্রে ভ্রমণ করান যার ফলে তিনি, আপন রাজে আসরারসমূহ ও আয়াত বা নির্দশনসমূহ জ্ঞাত হয়ে যান।

তিনি ঐ সত্তা আমিও যাকে “আলমে হাকায়েকে মেসালে” বা হাকিকতের দৃষ্টান্ত ভুবনে খোত্বা ইরশাদ করতে দেখেছি।

আমার এই মোশাহেদা আল্লাহর রাজ দরবারে তার অদৃশ্য উপস্থিতিতে “মোকাশেফায়ে কুলবী” ছিল। যখন আমি এই জগতে হজুরপাক (দ.)’র মোশাহেদা (নূর অনুধাবন) করেছি তখন তিনি “সৈয়দে আলম” জগৎ সমূহের সর্দার “মায়াসুমুল মাকাসেদ-নিষ্পাপ লক্ষ্যের লক্ষ্যস্থল, খোদার নূর অনুধাবনে সাহায্যকারী ও তাগাদা দাতাগণের সর্দার অবস্থায় (দেখেছি) তৎসময় তাঁর সম্মুখে সকল নবী রাসূল তৎ উম্মতসহ ও তাঁর উম্মতগণ যাঁরা শ্রেষ্ঠ জাতি সকলেই উপস্থিত ছিল।

তাঁর শ্রেষ্ঠ উম্মতগণ তাঁর দিকে মুতাওয়াজ্জু ছিল। আরশবাহী ফিরিশ্তাকুল তাঁর আনুগত্যাবস্থায় চর্তুদিকে গোলক বেঁধে দাঁড়ানো ছিল। নেক আমল হতে সৃষ্টি ফিরিশ্তারাও ইখলাসের সাথে সম্মুখে দণ্ডয়মান ছিল।

হ্যরত আবু বকর সিদ্দিক তাঁর ডানে ও হ্যরত উমর ফারঞ্জে আজম বামে করজোড়ে দাঁড়ানো ছিলেন। অনুপ্রেরণার শেষ কেন্দ্রস্থলের সম্মুখে সুললিত মধুর বাণী শ্রবণ আগ্রহে দোজানু হয়ে বসে মাওলা আলী নিজের জবানে তাঁর খাতেমুন্নবুয়তের ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছিলেন। হ্যরত উসমান জুন্নুরাইন সন্মের চাদর আবৃতাবস্থায় তাঁর শান আজমতের দিকে মোতায়াজ্জা ছিলেন।

এরপর “কাশ্ফে আজলী” নূরের খনি বা সুমধুর গুপ্ত সংবাদ সরবরাহ স্থলের “খাতেম” বা পরিসমাপ্ত স্তর। খাতেমিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি আমার মুখোমুখি হলেন। এই হৃকুমের ব্যাপারে তাঁর এবং আমার মধ্যে যোগসূত্র ছিল।

অতএব সর্দার (রব) তাঁকে বললেন, ইনি আপনার অবয়ব, আপনার সন্তান, আপনার খলিল!

আমার সামনে তাঁর মিস্বর উপস্থিত করে আমাকে ইঙ্গিত করে বললেন, হে মুহাম্মদ (ইবনে আরবি) এটার উপর দাঁড়িয়ে যাও, যেটা (মূলতঃ) আমি প্রেরণ করেছি আমার উপর।

বাহু নিশ্চয় তোমার কাছে আমার অনেক শে'র রয়েছে। তার জন্যই অবৈর্য হয়েছি মূলতঃ এটাই তোমার জাতের মধ্যে সুলতানিয়ত। অতএব নিজের ঐ “কুল্লিয়াত বা রচনাবলী” ছাড়া আমার দিকে রঞ্জু হইওনা। আর রঞ্জু হলে তাঁর সাক্ষাৎ আবশ্যিক। নিশ্চয় এটা “আ’লমে শেখা” বা হতভাগ্য জগতের নয় বরং আমার জন্য এটা উচ্চস্তরে উজ্জীয়মান অবস্থান বৈ আর কি? এটা “মালায়ে আলা” বা ফিরিশ্তা জগতে হামদ ও শোকরের স্তর।

অতএব, এই “অখাতেমীয়ত” বা “শেষ ভয়াবহ মিস্বর” আমাকে দান করেছেন যার এক অংশে সুউজ্জ্বল নূরের লিখা ছিল, “এটা পবিত্রতম মাকামে মুহাম্মদী” এতে আরোহনকারীগণ তাঁর “আহল”।

আল্লাহতায়ালা তাঁকে শরিয়তের আদেশ নিষেধের জন্য প্রেরণ করেছেন। ঐ সময় ওনাকে অনেক নেয়ামত এনায়েত করেছেন। অর্থাৎ মূলতঃ আমাকে “জাওয়ামিউল কালাম” দান করেছেন। আমি আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করলাম। এ অবস্থায় আমার কাছে রাসূল পাক (দ.) এর দাঁড়ানোর ও সমাসীনতার স্তর হাসিল হয়ে গেল।

এবং আমি যে দরজায় উন্নীত হয়েছি আমাকে সেখানে সাদা পোশাক ও বিছানা দেওয়া হল যেটাতে আমি বসেছি। তবে আমি রাসূলে পাক (দ.)-এর তাজিম তাক্রিমের ভিত্তিতে ঐ জায়গা/স্তর ব্যবহার করব না। কেননা এটা তিনি ব্যবহার করেছেন এবং এই নির্দেশ আমাকে এ ব্যাপারে (নবুয়ত) সতর্ক করার জন্যই গৃহীত হল।

এর উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যেই মকামে রাসূলে পাক (দ.) নিজের রবের মোশাহেদা করেছেন তাঁর ওয়ারিশগণের ক্ষেত্রে তা পর্দাবৃত থাকবে। অন্যথায় আমিও তাই দেখতাম যা তিনি

দেখেছেন। ঐ মারিফাত হাসিল করতাম যা তিনি হাসিল করেছেন।

কেননা তুমি দেখছেনা, যে তাঁর এভেবা/অনুসরণ করে সেই এর সংবাদ পেয়ে যায়। কিন্তু তাঁর তুরিকায় চলে তার মতো করে আল্লাহতায়ালার মোশাহেদা কখনো করেন না যেভাবে তিনি করেছেন।

তুমি জাননা তাঁর থেকে গুণাবলী অর্জনের সংবাদ কিভাবে লাভ করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলি মোশাহেদাকারী মাটির উপর দিয়ে চললে তাঁর পায়ের চিহ্ন মাটিতে লাগে। তুমি তাঁর পদচিহ্নই দেখবে এ বৈ আর কি। ওখানে অন্য এক গুপ্ত ভেদ নিহিত আছে। যদি তা তুমি তালাশ করো তবে পাবে। এটা এই জন্যই যে, তিনি ইমাম হন। যখন তাঁর ইমামত অর্জন হল তখন তাঁর মধ্যে তুমি না মোশাহেদার চিহ্ন পাবে, না তাঁকে চিনতে পারবে! তাঁর কাছে এমন বিষয় জ্ঞাত হয়ে গেল যা তিনি প্রকাশ করেন না।

এবং এই মকাম হ্যরত সৈয়দেনা মুসা (আ.) ও সৈয়দেনা রাসূল (দ.), হ্যরত খিজির (আ.)-এর মধ্যেকার (পরিচিতি পর্ব) ঘটনায় মুসার ইনকার হতেও প্রকাশ পায়।

যখন আমি এই সুউচ্চ স্তরে আরোহণ করলাম তখন আমার সামনে ঐ স্তরের চিহ্ন উপস্থিত ছিল, যা মেরাজ রজনীতে রাসূলে পাক (দ.) “কাবা ওয়া কাউসাইন আউ আদনা” অর্থাৎ তখন দুই ধনুকের ব্যবধান ছিল বা আরো কম (সূরা নজর : ৯) স্তরে দেখেছিলেন।

অতএব, আমি লজ্জিত হয়ে মুখ ঢেকে উঠে দাঁড়ালাম এবং “রঞ্জুল কুদ্স” এর সহায়তা অর্জন করলাম। তৎক্ষণাত আমি পূর্ব নির্ধারিত সত্য নিম্নোক্ত শে'র পাঠ করলাম।

“ইয়া মুন্যিলাল আয়াতি ওয়ান নাবায়ী
আন্যিল আলাইয়া মায়ালিমাল আসমায়ী
হাত্তা আকুনা লি হাম্দি জাতিকা জা’মীয়ান
বি মাহামিদাস সার্বাই ওয়াদ দার্বায়ী”

অর্থ: ওহে আসমানি কিতাব ও নবীগণকে প্রেরণকারী, আমার উপর আসমানী নিদর্শনসমূহ নাযিল করুন। যেন আপনার জাতেপাকের প্রশংসা গুণের সংগ্রহকারী হই, যেখানে আনন্দ ও বেদনা উভয় প্রকার প্রশংসা সংরক্ষিত।

আবার আমি রাসূল (দ.)-এর দিকে ইশারা করে বললাম, ইনি

[হজুর সৈয়দে আলম (দ.)] জ্ঞানের এমন সর্দার যিনি দাওরায়ে খোলাফা (আসমানী প্রেরিত পুরুষের যুগ) হতে উন্মুক্ত ।

যখন আদম (আ.) মাটি ও পানির মধ্যবর্তী ছিলেন তারও আগে “আস্ম লে করিম” বা মূল সম্মান হতে তাঁকে বানানো হয়েছে। তিনি (দ.) পূর্ববর্তী প্রত্যেক যুগে যুগে স্থানান্তরিত হয়ে শেষ যুগে দয়া পরবশ হলেন। তিনি (দ.) বিন্দুতা ও আনুগত্যময় ইবাদতে দিবারাত্রি এক যুগ হেরা গুহায় দণ্ডয়মান ছিলেন। এমনকি আপনার পক্ষ হতে জিব্রাইল (আ.) একান্ত সুনির্দিষ্ট সংবাদ সমূহের বাহক ছিলেন।

তাঁকে আমি বললাম, “আস্সালাম আলাইকা” আপনার উপর সালাম আপনি “মুহাম্মদ” (প্রশংসিত) “সির্রাল ইবাদ” (বান্দার রহস্য) ও “খাতামুন নবী” (শেষ প্রেরিত রাসূল)।

হে আমার সর্দার! আমি কি সত্যি বলেছি?

তিনি আমার উদ্দেশ্যে বললেন, তুমি সত্যি বলেছ। তুমি আমার চাদরের ছায়ায় আগ্রিত। অতএব, প্রশংসা বর্ণনা কর, আপন রবের প্রশংসা বর্ণনাতে প্রাণপন চেষ্টিত থাক। তবে তোমাকে সৃষ্টির রহস্য জ্ঞান দান করা হবে। আপন প্রভুর পক্ষ হতে তোমাতে যা বিকাশ পাবে তা আমারই বিকাশ হবে, আর তোমার দিল অঙ্ককার হতে মুক্ত থাকবে। প্রত্যেক সত্য বর্ণনা কর যা সত্যের উপর দণ্ডয়মান। তবেই তোমার কাছে বিনামূল্যে কিনা গোলাম আসবে।

অতএব আমি উচ্চস্বরে সার কথা “হজুর পাক” (দ.) এর দিকে ইঙ্গিত করে বলতে লাগলাম।

আমি ঐ আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করছি, যিনি আপনার উপর ঐ “কিতাবে মাকনুন” নায়িল করেছেন যা অব্যক্ত ও নাপাক হাতে ধরা যায় না।

“লা ইয়ামাসসুহ ইল্লাল মুতাহ হারুন” অপবিত্র অবস্থায় ইহা ধরিও না (সূরা ওয়াকিয়া-৭৯)। এই কিতাব তাঁর (দ.) উৎকৃষ্ট চরিত্র ও স্বভাব সমূহের পবিত্র প্রশংসা বর্ণনা করা এবং তাঁকে (দ.) সকল প্রকার বিপদ হতে সংরক্ষিত রাখার জন্য অবর্তীর্ণ হয়েছে।

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নুন, ওয়াল কালামে, ওয়ামা ইয়াসতুরুন। মা আন্তা বি নিয়ামাতি রাবিকা বি মাজনুন। ইল্লাকা লা অয়রান গাইরা মামনুন। ওয়া ইল্লাকা লা’আলা খুলুকীন আযিম। ফাসাতুবসিরু

ওয়া ইউবসিরুল।

অর্থ: নুন (দোয়াত) এবং কলমের শপথ এবং তা দিয়ে যা কিনা লিখা হয়েছে তার শপথ। আপনি আপন রবের অনুগ্রহে দিশেহারা নন। অবশ্যই আপনার জন্য অশেষ কল্যাণ। আপনি নিশ্চয় সুউচ্চ চরিত্রে অধিষ্ঠিত। সত্ত্বেও আপনি দেখবেন তারাও দেখবে (সূরা কলম : ১-৫)।

অতঃপর তিনি ইচ্ছার কলমকে জ্ঞানের আলোতে ডুবালেন (অর্থাৎ জ্ঞানের সাহায্য) এবং কুদ্রতি হস্তে যা ছিল যা হওয়ার এবং যা হবে, যা কিছু হবে না সকল কিছু এবং যা আল্লাহ তায়ালা চান, যা চান না সর্বকিছু লাওহে মাহফুজের তত্ত্বে লিখলেন এবং এ সকল ঐভাবেই হবে যেভাবে আল্লাহ তায়ালার কুদ্রতে জ্ঞাত ও পরিমিত এবং তার পবিত্র সংরক্ষিত জ্ঞানের ফলশ্রুতি। “সোব্হানা রাবিকা রাবিল ইজ্জতি আম্মা ইয়া সিফুন” অতএব আপনার রব সকল কিছু হতে পুতঃপবিত্র ও সম্মানিত (সূরা সাফ্ফাত : ১৮০)। ঐ আল্লাহ এককেরও একক, একক সত্ত্বা অংশীবাদীদের অংশীবাদ হতে পুতঃপবিত্র। (চলবে)

সুফি উদ্ধৃতি

- যিনি আল্লাহতা’য়ালার মা’রিফাত লাভ করেছেন, তিনি নিজেকে মূর্খ ও অজ্ঞ বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহতা’য়ালা সম্বন্ধে কিছুই জানে না, সে বলে বেড়ায় আমি ‘আল্লাহর তত্ত্বজ্ঞানী’। আরিফ লোক উজ্জীয়মান পাখির মত। আর যাহেদ (সংসার ত্যাগী) ভবঘূরে যুবকদের ন্যায়।
- সমুদয় সৃষ্টির জন্য যত নিয়ামত নির্ধারিত আছে, তা যদি তোমাকে দেয়া হয় তথাপি তুমি তার প্রতি ঝুঁকে পড়ো না। আর যদি ত্বরিকতের পথে সর্বপ্রকার দুর্ভাগ্য তোমার উপর আসে তথাপি তুমি নিরাশ হবে না। কেননা আল্লাহতা’য়ালার কাজ তাঁর ইঙ্গিত হওয়া মাত্রই অসম্ভব সম্ভব হয়ে যায়, তোমার সমস্ত দুর্ভোগ এক মুহূর্তে সৌভাগ্যে রূপান্তর হওয়া অসম্ভব কিছু নয়।
- যে ব্যক্তি নিজেকে কিছু মনে করে, নিজের ইবাদতকে খাঁটি এবং নিজের অন্তরকে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার বলে মনে করে, আর নিজের নফসকে সমস্ত নফসের চেয়ে নিকৃষ্ট বলে মনে করে না, সেই ব্যক্তি কোন গণনাতেই আসে না।

--- হ্যরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহ.)

নারী জাতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম

● আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইকবাল ●

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৬. মহিলাদের নিজ ঘরেই মুহরিম পুরুষদের মাধ্যমে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থাও করেন আল্লাহর রাসূল (দ.)। হ্যরত মালেক বিন হয়ারিস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, “আমরা কয়েকজন যুবক দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য নবী করীম (দ.) এর কাছে বিশ দিন পর্যন্ত অবস্থান করলাম। যে সময় তিনি উপলব্ধি করলেন যে, আমরা বাড়ী ফেরার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছি; তখন তিনি বললেন- নিজের স্ত্রী-পুত্রের কাছে ফিরে যাও এবং সেখানেই অবস্থান কর। তাদেরকে দ্বীন সম্পর্কে শিক্ষা দাও এবং তা মেনে চলতে নির্দেশ দাও”- (সহিহ বুখারী, হাদিস নং-৭২৪৬, ৬৭৫২ ই.ফা.)।
৭. মৌখিক শিক্ষার পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ (দ.) মহিলাদের লিখন পদ্ধতি শিক্ষায়ও উৎসাহ দিয়েছেন। যেমন, নবী করীম (দ.) হ্যরত শিফা বিনতে আবদুল্লাহ (রা.)কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, “তুমি একে (হ্যরত হাফসা রা.) কীট দংশন নিরাময়ের দোয়া শিক্ষা দাও যেমন তাকে লিখতে শিখিয়েছ”- (আবু দাউদ, হাদিস নং-৩৮৮৭)।
৮. অনেক মহিলা সাহাবী নিজেদের গৃহে শিক্ষা নিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন এবং অন্যান্য মহিলাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। যেমন- হ্যরত আয়েশা (রা.) এর শিক্ষা নিকেতন, এটা মসজিদে নবী সংলগ্ন তাঁর ভজুরা শরিফেকেন্দ্রিক ছিল (সূত্র: হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান, ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০১০, পৃ.২৬৪-২৬৫)। হ্যরত সাফিয়া (রা.) ও হ্যরত আসমা বিনতে উমাইস (রা.) এর কাছেও মহিলাগণ বিভিন্ন বিষয় জেনে নেয়ার জন্য আসতেন বলে বর্ণিত আছে।
৯. মহিলাদের শিক্ষা লাভের পথে প্রতিবন্ধকতা দূর করে তাদের মধ্যে জ্ঞান অর্জনের জন্য অদম্য স্পৃহা সৃষ্টি করেছেন আল্লাহর রাসূল (দ.)। তাই মহিলা সাহাবীগণ রাসূল (দ.) এর কাছে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করতে কৃষ্টিত হতেন না। সহিহ বুখারীর এক বর্ণনায় এসেছে, হ্যরত আয়েশা (রা.) বলেন,

- “আনসারী মেয়েরা কতই না উত্তম। দীনের বিধি-বিধানে পরিপৰ্কতা লাভের ক্ষেত্রে লজ্জা তাদের বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি”।
১০. উম্মাহাতুল মোমিনিন হতে সরাসরি প্রশ্ন করার মাধ্যমে। হ্যরত সুমামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি হ্যরত আয়েশা (রা.) এর সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে নাবীয় (পানিতে খেজুর কিংবা আঙুর গুলিয়ে প্রস্তুত এক প্রকারের পানীয়) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমার কাছে উল্লেখ করলেন যে, আবদুল কায়েসের প্রতিনিধি দল নবী (দ.) এর কাছে আসল এবং তারা নবী (দ.)কে নাবীয় সম্পর্কে প্রশ্ন করল। তিনি দুর্বা, নাকীর, মুয়াফফাত ও হান্তাম-এ তাদেরকে নাবীয় প্রস্তুত করণে বারণ করলেন। (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ৫০০৬ ই.ফা)। অন্য এক বর্ণনায় আছে, হ্যরত আয়েশা (রা.) একজন হাবসী দাসীকে ডেকে বললেন, একে জিজ্ঞেস করো। সে রাসূলুল্লাহ (দ.) এর জন্য ‘নাবীয়’ প্রস্তুত করতো’।
১১. জ্ঞানের বিষয় নিয়ে পুরুষ ও মহিলা সাহাবীদের মধ্যে বিতর্কে অংশ নেওয়ার মাধ্যমে। হ্যরত উম্মে ফয়ল বিনতে হারেস (রা.) থেকে বর্ণিত, আরাফাত দিবসে একদল লোক তাদের সামনে নবী (দ.) এর রোয়া রাখার বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করলো। তাদের কেউ কেউ বললো, তিনি রোয়া রেখেছেন। আবার কেউ কেউ বললো, তিনি আজ রোয়া রাখেননি। উম্মুল ফয়ল বলেন, ‘আমি নবী (দ.) এর কাছে এক পেয়ালা দুধ পাঠালে তিনি তা পান করেন। তিনি তখন উটের পিঠে সওয়ার ছিলেন’- (সহিহ বুখারী, হাদিস নং-১৯৮৮, আবু দাউদ, হাদিস নং-২১০৯ এবং সহিহ মুসলিম)
১২. প্রসিদ্ধ সাহাবীদের মাধ্যমে প্রশ্ন করেও মহিলা সাহাবীগণ বিভিন্ন বিষয় রাসূল (দ.) হতে জেনে নিতেন। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) এর স্ত্রী হ্যরত যয়নাব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, হ্যরত বেলাল (রা.) আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরা তাকে বললাম, আপনি নবী (দ.)-কে জিজ্ঞেস করুন, আমি আমার স্বামী ও

আমার কোলের ইয়াতীম শিশুদের জন্য যে সদকা (ব্যয়) করছি তা কি আমার জন্য যথেষ্ট হবে? আমরা তাঁকে একথা বললাম যে, নবী করিম (দ.)-কে আমাদের নাম বলবেন না। তখন হ্যরত বেলাল (রা.) নবী করিম (দ.) এর কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন, মহিলা দু'জন কে? হ্যরত বেলাল বললেন, যয়নাব। রাসূল (দ.) বললেন, কোন যয়নাব? হ্যরত বেলাল (রা.) বললেন, হ্যরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) এর স্ত্রী। তখন রাসূলুল্লাহ (দ.) বললেন, হ্যাঁ! সে দ্বিতীয় পুরুষার লাভ করবে। আত্মীয়তার (অধিকার রক্ষার) পুরুষার ও দান করার পুরুষার। অন্য এক বর্ণনায় আছে, “তুমি যে দান করবে, তোমার স্বামী ও সন্তানই তা পাওয়ার অধিক হকদার”- (সহিহ বুখারী, হাদিস নং-১৪৬২, ১৪৬৬ ও সহিহ মুসলিম)।

মুসলিম নর-নারী দ্বীন-দুনিয়ার জন্য যতটুকু জ্ঞান না থাকলে চলে না ততটুকু জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। এ প্রসঙ্গে গবেষকগণের মত হলো- দ্বীনের জন্য তার নিম্নে উল্লেখিত বিষয় ও পরিমাণ শরিয়তের জ্ঞান থাকতে হবে-

১. যতটুকু জ্ঞান থাকলে শিরুক-কুসংস্কার মুক্ত সঠিক আকৃতি-বিশ্বাস ধারণ করা যায়।
২. যতটুকু জ্ঞান থাকলে শরিয়তের বিধি-বিধান মেনে বাহ্যত নির্ভুলভাবে আল্লাহ রাবুল আলামিনের ইবাদত করা যায়।
৩. যতটুকু জ্ঞান দ্বারা নিজেকে পরিশুল্ক, অন্তরকে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখা যায়। তা এভাবে যে ভালো গুণগুলো জানবে এবং সে অনুযায়ী নিজেকে গঠন করবে, আর খারাপ দোষগুলো জানবে, আর তা থেকে নিজেকে দূরে রাখবে।
৪. যতটুকু জ্ঞান থাকলে একজন মানুষ পরিবার, সমাজ এবং সর্বোপরি নিজের সাথে সঠিক আচরণ করতে পারে, পাশাপাশি সে জানতে পারে কোনটি হারাম, কোনটি হালাল, কোনটি ওয়াজিব, কোনটি ওয়াজিব নয় এবং কোনটি উচিত এবং কোনটি উচিত নয়। [রাসূলুল্লাহ (দ.) শিক্ষাদান পদ্ধতি, ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, বাই.সি., ঢাকা, ২০১১, পৃ.১৩০-১৩১]

আবদুল হালীম আবু শুকরআহ বলেন, ‘নারীর উপর অর্পিত দায়িত্ব সে যাতে যথাযথভাবে পালন করতে পারে তাই তাকে সুশিক্ষা দিতে হবে। কারণ শরিয়তের একটি নীতি হলো-

‘কোন ওয়াজিব সম্পর্ক করতে যা প্রয়োজন, তাও ওয়াজিব’ [রসূলের (স.) যুগে নারী স্বাধীনতা, আবদুল হালীম আবু শুকরআহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৭]। এছাড়াও প্রয়োজনের তাগিদে অনেক কিছু শিখাও জরুরী হয়ে পড়ে। আবার কোন কিছুর জ্ঞান না থাকলে তা সে বিষয়ের বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন, ‘অতপর তোমরা জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিকট জিজ্ঞেস কর, যদি তোমরা না জান’-(সূরা আন নাহল: ৪৩)। আধুনিক যুগে নারী-শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ চিন্তা করা যেতে পারে।

১. নারীকে পর্যাপ্ত-উপযুক্ত শিক্ষা দেয়া উচিত, যাতে ইসলামী প্রশিক্ষণের সাধারণ লক্ষ্যসমূহ অর্জিত হওয়ার পাশাপাশি দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্জিত হয়। প্রথম বিষয়টি হলো নারী যেন সর্বেত্তমরূপে গৃহ ও সন্তানাদির তত্ত্বাবধানে সক্ষম হয় এবং বিয়ের পর তার দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়। আর দ্বিতীয় বিষয়টি হলো উপযুক্ত পেশাগত কাজের জন্য নারীকে দক্ষ করে গড়ে তোলা, যাতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক অথবা সামাজিক যে কোন প্রয়োজনে তাকে কাজে লাগানো যায়। [রাসূলের (দ.) যুগে নারী স্বাধীনতা, আবদুল হালীম আবু শুকরআহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৮]
২. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীদের পেশাগত কাজে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। আল্লাহর নবীর (দ.) যুগে মহিলারা কুটির শিল্পের কাজ করত। সাহল (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন এক মহিলা একখানা ‘বুরদা’ নিয়ে আসলো। সাহল (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, ‘বুরদা’ কি আপনারা জানেন? বলা হলো, হ্যাঁ! এক প্রান্তভাগে নকশা করা বড় চাদর। সে (মহিলা) বললো, হে আল্লাহর রাসূল (দ.) আমি আপনাকে পরিধান করানোর জন্য নিজ হাতে এ চাদর বুনেছি। নবী করিম (দ.) সাথে তার নিকট থেকে সেটি নিলেন। পরে তিনি তা পরিধান করে আমাদের কাছে আসলেন....”-(সহিহ বুখারী, হাদিস নং-১২৭৭)। আর একজন মহিলা সাহাবী নাসির ও চিকিৎসার কাজ করতো, হ্যরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দক যুদ্ধের সময় সাঁদ আহত হলে....নবী (দ.) নিকট থেকেই যাতে তার সেবা-যত্ন করতে পারেন সে উদ্দেশ্যে তার জন্য মসজিদে তাঁরু খাটিয়ে দিলেন....”-(সহিহ বুখারী, হাদিস নং- ৩৯০১, ৪১১৭, ৪১২২, ১৭৬৯ ও সহিহ মুসলিম)। হাফেজ ইবন হাজার বলেছেন, ইবন

ইসহাক উল্লেখ করেছেন যে, তাঁবুটি রঞ্জাইদা আসলামিয়ার (রা.) উদ্দেশ্যে খাটানো হয়েছিল। তিনি একজন মহিলা চিকিৎসক ছিলেন। তিনি আহতদের চিকিৎসা করতেন। নবী (দ.) বলেছিলেন তাকে (সাঁদ রা.) রঞ্জাইদার (রাঃ) তাঁবুতে রাখো যাতে আমি নিকটে অবস্থান করে তার সেবা-শুশ্রাব করতে পারি- [রাসূলের (দঃ) যুগে নারী স্বাধীনতা, আবদুল হালীম আবু শুককআহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭১,৩৭২]। সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম রাসূলুল্লাহ (দ.) এর যুগে মহিলারা পশু চরাত, কুটির শিল্পের কাজ করতেন নার্সিং সহ অনেক কাজে পর্দাসহকারে পুরুষদের মতই অংশ নিতেন। (এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে)

৩. মহিলাদের জন্য জুময়া ও ঈদের নামায়ের খুতবা শুনার ব্যবস্থা করতে হবে এবং সেখানে তাদের বিশেষ নসিহতমূলক আলোচনা থাকতে হবে।

৪. মহিলাদের জন্য আলাদা শিক্ষা নিকেতন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অর্থাৎ সহশিক্ষার পরিবর্তে স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। আর যদি সর্বক্ষেত্রে এরূপ করা সম্ভব না হয় তবে, শরিয়ত সম্মতভাবে পর্দা সহকারে মহিলাদের অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহিলাদেরকে তাদের পর্দা রক্ষায় সহযোগিতা ও উৎসাহিত করা। এ প্রসঙ্গে গবেষকগণের মন্তব্য হলো- ‘পেশাগত কাজে [চাই তা শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রেও হতে পারে] নারীর অংশগ্রহণ যে ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে সাক্ষাতের দাবি করে সে ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়কেই পরম্পর অংশগ্রহণের নিয়ম-নীতি অনুসরণ করতে হবে।’ [রাসূলের (দ.) যুগে নারী স্বাধীনতা, আবদুল হালীম আবু শুককআহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৪]

৫. বিখ্যাত ইসলামী স্কলারদের বক্তব্য-ওয়াজ-মাহফিলে এবং বিভিন্ন শিক্ষামূলক সভা-সেমিনারে মহিলাদের জন্য পর্দা সহকারে আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে। এ বিষয়ে গবেষকগণ উল্লেখ করেন- ‘নারীদের প্রখ্যাত ও জ্ঞানসমৃদ্ধ শিক্ষকদের নিকট থেকে জ্ঞানার্জনে বাধা দেয়া উচিত না। কিংবা পুরুষদেরকেও প্রখ্যাত ও জ্ঞান সমৃদ্ধ কোন মহিলা শিক্ষকের নিকট থেকে জ্ঞানার্জনে বাধা দেয়া উচিত হবে না।’ [রসূলের (স.) যুগে নারী স্বাধীনতা, আবদুল হালীম আবু শুককআহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১]

৬. নিজগৃহে সাধ্যের মধ্যে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং বই পাঠে মহিলাদের উৎসাহ দিতে হবে।
৭. স্বামী-স্ত্রী পরম্পরের মধ্যে আলোচনা করে জ্ঞান চর্চা করা যায়। অবসর সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে তারা পরম্পর আলোচনার মাধ্যমেও জ্ঞান অর্জন করতে পারে। এছাড়াও মুহরিম পুরুষের সাথের মহিলারা জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতে পারে।
৮. সমাজের চাহিদা অনুযায়ী নারীদের ধর্মীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। কারণ, নার্সিং এর মত বিশেষ পেশার জন্য, ছাত্রীদের পাঠদানের জন্য, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের সেবা প্রদানের জন্য- ইত্যাদি পেশায় প্রশিক্ষিত মহিলা কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রয়োজন। এ ব্যাপারে আবদুল হালীম আবু শুককআহ অত্যন্ত সুন্দরভাবে উল্লেখ করেন- মুসলিম সমাজের কাঠামো ও সংহতি সংরক্ষণের নিমিত্তে নারীদের জন্য ফরযে কিফায়া পর্যায়ভুক্ত কাজসমূহ আদায় করার সময়। [প্রকৃতপক্ষে ‘ফরযে কিফায়া’ হলো যে ফরয করেকজন আদায় করলে সবার পক্ষ হতে আদায় হয়ে যায়, আর কেউ আদায় না করলে সবাই গুনাহগার হয়।] পেশাগত কর্মের ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজের কোন প্রয়োজনীয়তা সামগ্রিকভাবে গোটা নারী সমাজের জন্য যে সব কাজ সম্পাদন অত্যাবশ্যকীয় করে দেয় এবং ঐ কাজ যদি প্রকৃতপক্ষে এককভাবে নারীদের দায়িত্বভুক্ত হয় কিংবা তাতে তাদের অংশগ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয় অথবা ঐ কাজ প্রকৃতপক্ষে এককভাবে পুরুষদের দায়িত্বভুক্ত হয়, কিন্তু পুরুষদের একক প্রচেষ্টায় তা সম্পাদন অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং নারীদের প্রচেষ্টার মুখাপেক্ষী হয়, তাহলে সমাজের প্রয়োজনের বিবেচনায় ঐ সব কাজ আঞ্চাম দেয়া নারীর জন্য ফরযে কিফায়া হিসেবে পরিগণিত হয়। যেমন: নারীদের শিক্ষা, চিকিৎসা-নার্সিং, শিশুদের লালন-পালন ও শিক্ষাদান, ইয়াতিমদের তত্ত্বাবধান, শিশু সংশোধন কেন্দ্র এবং অনুরূপ সমাজসেবামূলক কাজ। [রাসূলের (দ.) যুগে নারী স্বাধীনতা, আবদুল হালীম আবু শুককআহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৮, ৩৯১]

(চলবে)

সালামের মাধ্যমে অভিবাদন জ্ঞাপনই মুসলিম উম্মাহ'র ঐতিহ্য

● মোহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন ●

অভিবাদন হলো উম্মাহ বা জাতির বিশেষ পরিচায়ক। মনস্তত্ত্ববিদদের মতে, পরিচিত অপরিচিত কারও সাথে সাক্ষাতের প্রথম দিকের মুহূর্তগুলো পারস্পরিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মনস্তাত্ত্বিকভাবে (Psychologically) বিশেষ প্রভাব ফেলে। মানুষ সাধারণত এ সময়ের কুশল বিনিময়ের উপর ভিত্তি করে একে অপরের বিষয়ে ধারণা করে থাকে। এ কুশল বিনিময়ের প্রারম্ভিকায় ব্যবহৃত অভিবাদন যদি হয় কল্যাণময়তার আকর, পারস্পরিক সম্প্রীতিবর্ধক সূত্র, এবং বিশেষত উম্মাহর ‘সার্বিক জীবনব্যবস্থার প্রতীক’- তাহলে কেমন হয়! আর সুনিপুণ এই সৃষ্টির অদ্বিতীয় কুশলী নির্মাতা মহান রাব্বুল আলামিন মানবজাতিকে উপহার দিয়েছেন ‘ঠিক একটি অভিবাদন’। যা সাক্ষাৎ হওয়ার সাথে সাথেই ‘আস্স সালামু কুবলাল কালাম’ নীতির আলোকে পারস্পরিক কল্যাণের প্রার্থনা করে; যা আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লামার ইরশাদ মতে ‘উম্মাহর মধ্যকার সম্প্রীতি বৃদ্ধিকারক এক অত্যাশ্চর্যজনক সূত্র’; বিশেষত যা উম্মাহকে তথা উম্মাহর সম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থাকেই উপস্থাপন (Represent) করে।

কী এই অভিবাদন? এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে, “আর কেউ যখন তোমাদের সালাম দেয়, তখন তোমরা কমপক্ষে সে-রকম অথবা তার চেয়েও বেশি সম্মানসহকারে সালামের জবাব দেবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব বিষয়েই হিসাব গ্রহণকারী”-(সূরা নিসা : ৪:৮৬)। ইসলামের দৃষ্টিতে পারস্পরিক সাক্ষাতকালে প্রাথমিক পরিচয় এবং অভ্যর্থনার নিয়ম হচ্ছে সালাম বিনিময়। এ প্রসঙ্গে হ্যারত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদিস শরিফে উল্লেখ আছে “আল্লাহ তায়ালা হ্যারত আদম (আ.)-কে তাঁর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর উচ্চতা ছিল ষাট গজ (হাত)। তাঁকে সৃষ্টি করে আল্লাহ তায়ালা বলেন, যাও এবং অবস্থানরত ফেরেশ্তাদের ঐ দলটিকে সালাম কর। আর তারা তোমার সালামের উভয়ে কী বলে তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর। তাঁরা যে উভয়ে দেবে তা তোমার এবং তোমার সন্তানদের সালামের উভয়। অতঃপর হ্যারত আদম (আ.) গিয়ে তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন, ‘আসসালামু আলাইকুম’। অতঃপর ফেরেশ্তাগণ উভয়ে বললেন, ‘আস্সালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহ’। আল্লাহর হাবিব (দ.) বলেন, তাঁরা (ফেরেশ্তাগণ) উভয়ে ‘ওয়া রাহমাতুল্লাহ’ অংশটি বৃদ্ধি করেছেন। অতঃপর আল্লাহর হাবিব (দ.) বলেন, যে ব্যক্তিই জান্নাতে প্রবেশ করবে সে হ্যারত আদম (আ.)-এর আকৃতিতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তার উচ্চতা হবে ষাট গজ (হাত)। তখন হতে অদ্যাবধি সৃষ্টিকুলের উচ্চতা ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে আসছে।”^১ উল্লেখ্য যে, সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকিরিত অনন্ত শান্তির ধারক ফেরেশ্তাদের নিকট থেকে

সম্প্রীতি ও আদব বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞাত হবার লক্ষ্যে এটি হ্যারত আদমের প্রতি আল্লাহর ইবাদতগত একটি নির্দেশিকা।

উম্মাহর তরে মহান রাব্বুল আলামিনের প্রদত্ত এই তালিমই অভিবাদন হিসেবে আমাদের কাছে ‘সালাম’ পরিভাষায় পরিচিত। পৃথিবীর বুকে আদমের আগমনের শুরু থেকেই এই অভিবাদন-ই আচারিক সভ্যতার আকর হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছে। আলোকপাতের প্রাসঙ্গিকতায় পরিভাষাটির আভিধানিক পরিচয় উঠে আসা প্রয়োজন। এর আভিধানিক অর্থ হলো,

- ‘আ-মান’ তথা নিরাপত্তা (Security),
- ‘সুকুন’ তথা শান্তি (Peace) ইত্যাদি।^২

বস্তুত উপর্যুক্ত অর্থ দুটিই অভিবাদনটির মৌলিক সারমর্ম। এবং এ দুটির বিবেচনায়-ই অভিবাদনটি উম্মাহর সার্বিক জীবনব্যবস্থার শব্দগত প্রতীক। উল্লেখ্য, অর্থ দুটি বাহ্যিকভাবে অনেকটা সমার্থক মনে হলেও মূলত ভিন্নার্থক। বস্তুত শান্তির পূর্বশর্তই হলো নিরাপত্তা। শান্তির ঠাঁই সেখানেই, যেখানে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত।

অর্থন্দৱের প্রামাণিক বিশ্লেষণ:

- আ-মান তথা নিরাপত্তা: সাধারণত ব্যক্তির জান ও মালের উপর বিপদের কোন প্রকার আশংকা না থাকা বা বিঘ্নতা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা না থাকার ব্যবস্থাপনাকে নিরাপত্তা বলা হয়।

পবিত্র কুরআনে সালাম শব্দটি ‘নিরাপত্তা’ অর্থে ব্যবহারঃ পবিত্র কুরআনে সালাম শব্দটি ‘নিরাপত্তা’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, ‘তাদেরকে বলা হবে, তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করো।’^৩

পবিত্র হাদিসে সালাম শব্দটি ‘নিরাপত্তা’ অর্থে ব্যবহারঃ পবিত্র হাদিসেও সালাম শব্দটির ‘নিরাপত্তা’ অর্থে ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন, হ্যারত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (দ.) ইরশাদ করেন, ‘প্রকৃত মুসলিম সেই, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য সকল মুসলিম ‘নিরাপদ’ থাকে।’^৪

২. সুকুন তথা শান্তি: শান্তি হলো, কোন প্রকার সংঘর্ষবিহীন সময়কাল। বৃহৎ পরিসরে শান্তি বলতে একতাবন্ধতা, স্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজমান থাকাকে বুঝায়।

পবিত্র কুরআনে সালাম শব্দটি ‘শান্তি’ অর্থে ব্যবহারঃ পবিত্র কুরআনে সালাম শব্দটি ‘শান্তি’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে মর্মে পরিদৃষ্ট হয়। যেমন, ‘যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়, এটা দ্বারা তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন...।’^৫

পবিত্র হাদিসে সালাম শব্দটি ‘শান্তি’ অর্থে ব্যবহারঃ যেমন, কবর যেয়ারতে পঠিতব্য দোয়া সংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন রাবি থেকে বর্ণিত একাধিক হাদিস শরিফে সালাম শব্দটি ‘শান্তি প্রদান’

অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।^৫

পবিত্র কুরআন-হাদিসের আলোকে ‘সালাম’র উপর্যুক্ত অর্থব্যবহৃত সমাজে প্রতিফলনের নির্দেশনা: অপরের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে সমাজে শান্তি বজায় রাখা মানুষের জন্য অত্যাবশ্যক। কেননা এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআন ও হাদিসে সুস্পষ্টভাবে অসংখ্য নির্দেশনা এসেছে। উদাহরণস্বরূপ পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত নিচে উপস্থাপন করা হলো:

ক) ‘নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি ব্যতিরেকে কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন পৃথিবীর সমগ্র মানব গোষ্ঠীকে হত্যা করল। আর কেউ কারও প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন পৃথিবীর সমগ্র মানব গোষ্ঠীকে রক্ষা করল।’^৬

খ) ‘আর তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের সম্পদ অবৈধ পদ্ধতিতে গ্রাস করো না এবং শাসকদের সামনেও এগুলোকে এমন কোন উদ্দেশ্যে পেশ করো না যার ফলে ইচ্ছাকৃতভাবে তোমরা অন্যের সম্পদের কিছু অংশ গ্রাস করার সুযোগ পেয়ে যাও।’^৭

গ) ‘হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরম্পরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। ব্যবসা হতে হবে পারম্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে। আর একে অপরকে হত্যা করো না। নিশ্চিত জানো, আল্লাহ তোমাদের প্রতি মেহেরবান।’^৮

এ ব্যাপারে পবিত্র হাদিসেও অসংখ্য নির্দেশনা পরিলক্ষিত হয়। যেমন:

ক) ‘যদি কোনো ব্যক্তি নিরাপত্তাপ্রাপ্ত কোনো অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করে, তবে সে ঘাতক জালাতের সুস্থানে পাবে না। অথচ জালাতের সুস্থান চালিশ বছরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।’^৯

খ) হ্যরত সুফিয়ান ইবনে সালিম (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (দ.) ইরশাদ করেন, ‘জেনে রেখ, কোন মুসলমান যদি অমুসলিম নাগরিকের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন করে, কোনো অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করে, তার কোনো জিনিস বা সহায়-সম্পদ জোরপূর্বক কেড়ে নেয়, তবে কেয়ামতের দিন আল্লাহর বিচারের কাঠগড়ায় আমি তার বিপক্ষে (নির্যাতিত) অমুসলিমদের পক্ষে অবস্থান করব।’^{১০}

গ) হ্যরত সাইদ ইবনে যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (দ.) ইরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি কারও এক বিঘত পরিমাণ জমি ও অন্যায়ভাবে দখল করবে তবে সাত তবক জমি তার গলায় বেড়ি আকারে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।’^{১১} অধিকন্তু, মহান রাবুল আলামিনের প্রদত্ত শরিয়তে মোহাম্মদীর যে পাঁচটি ‘মাক্কাসিদুশ্ শরিয়াহ তথা শরিয়তের উদ্দেশ্য’ রয়েছে সেগুলো অনুধাবনেই উপর্যুক্ত আলোকপাত্রের সত্যতা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাব হয়। উল্লেখ্য, মাক্কাসিদুশ্ শরিয়াহ হলো,

১. ধর্মের সংরক্ষণ,
২. জানের সংরক্ষণ,
৩. বিবেক-বুদ্ধির সংরক্ষণ,
৪. বংশধারার সংরক্ষণ ও
৫. মালের সংরক্ষণ।

নবী-জীবনের দর্পণে উপর্যুক্ত আলোকপাত: আল্লাহর হাবিব (দ.) যে মূলত জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানবজাতির জানমালের রক্ষাকর্তা-কাঞ্চারী ছিলেন- তা তো ইতোমধ্যেই প্রতিভাব। উল্লেখ্য যে, উপর্যুক্ত “মাক্কাসিদুশ্ শরিয়াহ” আধুনিক গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের বিমূর্ত স্নোগান ‘জীবন, স্বাধীনতা এবং সম্পদ’ সম্পর্কিত নিরাপত্তা বিষয়ক ঘোষণা প্রদানের অনেক পূর্বেই বিশ্বনবী (দ.) কার্যকর করেছিলেন। তথাপি মহা-মহিম এ সত্ত্বার মহিমান্বিত জীবনের এতদসংশ্লিষ্ট একটি দিক উল্লেখ না করলে বোধহয় অপূর্ণই থেকে যায়। একথা সর্বজন জ্ঞাত যে, আল্লাহর হাবিব (দ.)-কে তাঁর বাল্যকালেই তাঁর কাছে কেউ লক্ষ-দিরহাম আমানত রাখলে বহুবছর পরে এসে সেটা আবার অবিকল যথাযথভাবে ফেরত পেত। তাছাড়া তিনি শৈশব-কৈশোরেও কখনো কোন অবস্থায়-ই সত্যের অপালাপ করেন নি। তাঁর এ সত্যবাদিতা ও আমানতদারীতে তিনি তাদের কাছে এতটাই বিশ্বাসের পাত্র ছিলেন যে, তাঁকে অবিশ্বাস করার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারত না। এমনকি এক পর্যায়ে আরববাসীরা তাঁকে ‘আল্লাহ আমিন তথা বিশ্বাসী’ উপাধি দিয়েছিল। এরূপ আরেকটি ঘটনা হলো, অনবরত যুদ্ধ-বিগ্রহে আরবের অগণিত পরিবার যখন বিধ্বস্ত তখন এরূপ পরিস্থিতির অবসানকল্পে আল্লাহর হাবিব (দ.) হারবুল ফুজ্জার তথা ফুজ্জার যুদ্ধের পর যুবকদের নিয়ে ‘হিলফুল ফুজুল তথা শান্তিসংঘ’ প্রতিষ্ঠা করেন।

উপর্যুক্ত ঘটনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, আল্লাহর হাবিব (দ.) সেই বাল্যকাল থেকেই মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা রক্ষা ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সর্বদা তৎপর ছিলেন।

উপর্যুক্ত প্রামাণিক উপস্থাপনার মাধ্যমে একথা সুস্পষ্টরূপে পরিস্ফুট যে, সালাম হচ্ছে এ উম্মাহর ঐতিহ্য। মানুষের মধ্যে পারম্পরিক সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে এ ধরনের অভিবাদন হচ্ছে উম্মাহর পক্ষ থেকে শান্তি-সম্প্রীতি-সৌহার্দ প্রকাশের বীতি। সালাম উত্তোলন পরিহার এবং জঙ্গিত নিবারণের মৌলিক সূত্র হিসেবে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে সর্বাধিক চর্চা হয়ে থাকে। মুসলিম উম্মাহর জন্যে সালাম একটি চিরন্তন সওগাত।

তথ্যসূত্র:

১. সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম,
২. আল্লাহ মুজামুল ওয়াসিত (আরবি); লিসানুল আরব (আরবি); আল-কুমামুল ইসতিলাহি; আল-কুমামুল ওয়াফিয়; আল-মুজামুল ওয়াফি প্রভৃতি অভিধান,
৩. আল্লাহ কুরআন- ৫০:৩৪,
৪. সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম, সুনানে নাসায়ি, সুনানে আবু দাউদসহ হাদিসের আরও একাধিক কিতাব,
৫. আল্লাহ কুরআন- ৫:১৬,
৬. সহিহ মুসলিম, সুনানে তিরমিয়ি,
৭. আল্লাহ কুরআন- ৫:৩২,
৮. আল্লাহ কুরআন- ২:১৮৮,
৯. আল্লাহ কুরআন- ৪:২৯,
১০. সহিহ বুখারি; সুনানে ইবনে মাজাহ,
১১. সুনানে আবু দাউদ,
১২. সহিহ বুখারি; সহিহ মুসলিম; মুসনাদে আহমদ।

সুফি সাধকের জীবন প্রবাহের মূলনীতি

● মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম ●

“ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন।” তাফসিরকারগণ ‘লিয়াবুদুন’ শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন ‘লিয়ারিফুন’। অতএব আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ হল “আমি মানুষ এবং জিন সৃষ্টি করেছি ইবাদত তথা খোদায়ী রহস্যের মর্মভেদ তালাশ করার জন্য।” মানব সৃষ্টির পশ্চাতে মূলত এই উদ্দেশ্যটিই প্রধান। তাই ইসলামের প্রকৃত স্নেতধারার অনুসারী তথা তাসাউফপন্থীরা নিজেদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ মহান প্রভুর পরিচয় অনুসন্ধানে অতিবাহিত করে থাকেন। আর এই ধারায় তাঁরা নিজেদের জীবনের কতিপয় মৌলিক নীতিমালার অনুসরণ করেন। আলোচ্য নিবন্ধে তাসাউফ তথা সুফিবাদের মূলনীতি সমূহ সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করার চেষ্টা করব -ইনশাআল্লাহ্।

তওবা:

তওবা অর্থ অনুত্পন্ন হওয়া, অন্যায়-অপরাধ না করার জন্য সংকল্পবন্ধ হওয়া, কৃত কর্মের জন্যে লজ্জিত হয়ে ঠিক পথে ফিরে আসা। মানুষ যখন আল্লাহ রাবুল আলামিনের নির্দেশ বিশ্বৃত হয়; ভুল পথে পা বাড়িয়ে বিপথগামী হওয়ার পর পুনরায় সঠিক পথে ফিরে আসাকে তওবা বলে। তওবাকারীদের ব্যাপারে আল্লাহ পাক বলেন-“নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তওবাকারীদের ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন”-(সূরা বাকারা-২২২)। যারা তওবা করে নিজেদেরকে সংশোধন করে আল্লাহকে দ্রুতভাবে অবলম্বন করে এবং আল্লাহর জন্য তাদের ধর্মকে পবিত্র নির্মল করে তারা মুমিন বিশ্বাসীদের সঙ্গে থাকবে” - (সূরা নিসা-১৪৬)। হ্যরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (দ.) বলেন- ‘আল্লাহ এমন মুমিন ব্যক্তিকে ভালোবাসেন, যে গুনাহ করার পর তওবা করে’ (মিশকাত)। তাই তাসাওউফের মূলনীতি সমূহের মধ্যে তওবার গুরুত্ব অত্যধিক। ইমাম জাফর সাদেক (রা.)’র পুত্র আবু মোহাম্মদ জাফর ইবনে সাদেক (র.) বলেন- “তওবা ছাড়া ইবাদত হয়না। আল্লাহ তায়ালা ইবাদতের পূর্বে তওবার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন-তওবাকারী এবং ইবাদতকারী।” তওবা তথা আপন কৃতকর্মের অনুশোচনা করার মাধ্যমেই মহান প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়। মাওলানা বজলুল করিম মন্দাকিনী বলেন- অপরাধী আমার মত, নাই বটে ত্রিজগত। তোমার কর্ম ক্ষমা বিতরণ।। অপর এক সুফি কবি সায়্যাদ বলেন,

“যা করেছি অপরাধ ক্ষমা করো রববানা,
সোজাও পথে চালাও এবে অন্যপথে নিওনা।
কুভাবনা ভুলাইয়া সোজা পথে লও টানিয়া,
নামে আম্মারার তাবে আমাকে আর করোনা।”

তাওয়াক্কুল:

তাওয়াক্কুল শব্দের অর্থ ভরসা করা, আস্থা রাখা, নির্ভর করা। যে, কোনো কঠিন মুহূর্তে চরমভাবে হতাশ কিংবা অবসাদগ্রস্ত না হয়ে মহান রাবুল আলামিনের অনুগ্রহের প্রতি আস্থা রাখাই হচ্ছে তাওয়াক্কুল। মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তাঁরা সকল বিপদ-আপদে, মহাসংকটে অস্থির না হয়ে আল্লাহর অনুগ্রহের উপর তাওয়াক্কুল করে। মুমিনের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন- “মুমিন তো তারা, যাদের অন্তরসমূহ কেঁপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। আর যখন তাদের ওপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা তাদের দ্রীমান বৃদ্ধি করে এবং যাঁরা তাদের রবের ওপরই ভরসা করে” -(সূরা আনফাল-২)। তাওয়াক্কুলের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)। ঘরের ছাউনি মেরামতের কাজে চারজন কামলা (মজুর) কাজ করছে। দুপুরের খাবারের সময় হয়েছে কিন্তু ঘরে দানা পরিমাণ খাবার নেই। মজুররা গোসল করে যখন খাবার খেতে আসছে তখনও ঘরে খাবারের ব্যবস্থা হয়নি। তবুও হ্যরতের কথামত তাঁর আম্মাজান খাবারের বিছানা বিছিয়ে দেন। পরিবারের সদস্যদের চিন্তার মাত্রা ক্রমশ বাড়ছে। বাড়ির লোকেরা কানাকানি করে বলছে, ইজ্জত-সম্মানের কিছুই অবশিষ্ট থাকল না। এরূপ চরম মুহূর্তেও হ্যরত আকদাস নির্লিপ্ত। তাওয়াক্কুলের জায়গায় চির অনড়। অতঃপর মুহূর্তেই মহান প্রভুর অনুগ্রহে মান্নাছালওয়া দৃশ উপটোকন পোলাও কোরমা খাবার নিয়ে হাজির তিন ব্যক্তি। তাওয়াক্কুল সম্পর্কে এর চেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ কি-ই বা হতে পারে! কবিয়াল রমেশের সুরে বলতে হয়- তোমার পাক নামে ভরসা করে দিয়াছি সাতার। পার কর ডুবাইয়া মার, মহিমা তোমার।।

তাকওয়া:

তাকওয়া শব্দের অর্থ বিরত থাকা, পরহেজ করা, পরিবর্জন করা। মহান আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় অন্যায়, পাপ ও অনৈতিক কাজ এবং অশ্রীল বাক্য বিনিময় হতে বিরত থাকাই হচ্ছে তাকওয়া। তাকওয়া সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন- “তোমরা আল্লাহকে ভয় কর নিশ্চয়ই আল্লাহ মুক্তিদের সাথে আছেন”

-(সূরা বাকারা-১৯৪)। অপর আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন- “নিশ্চয়ই আল্লাহ মুক্তিদের ভালবাসেন” - (সূরা তাওবা-৪)। হ্যরত উবাই ইবনে কাব (রা.) কে হ্যরত উমর (রা.) তাকওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন-” হে উমর! পাহাড়ের দুই ধারে কাঁটাবন, সাবধানে সরু পথ। এমতাবস্থায় কিভাবে চলতে হবে? হ্যরত উমর (রা.) বলেন- গায়ে যেন কাঁটা না লাগে, সাবধানে পথ অতিক্রম করতে হবে। হ্যরত উবাই ইবনে কাব (রা.) বলেন-এটাই তাকওয়া।” অর্থাৎ দুনিয়াবি জীবন অতিবাহিত করার ক্ষেত্রে ষড়রিপুর তাড়নায় মোহগ্রস্ত না হওয়াই হল তাকওয়া। অছিয়ে গাউসুল আয়ম হ্যরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাওরী (ক.)’র অমীয় বাণী- অনথেরী পরিহারে তাকওয়ার ঝলক দেখেছি, পরন্তে অলির পরন পন্থা নির্দেশ দিতেছি।

সবর:

সবর শব্দের অর্থ ধৈর্য ধারণ করা, ভাল কিছুর জন্য অপেক্ষা করা, সহিষ্ণুতা প্রদর্শন। বালা, মুসিবত, দুঃখ, দুর্দশা, ঝামেলাময় পরিস্থিতিতে চরমভাবে অস্ত্রি ও হতাশাগ্রস্ত না হয়ে সহ্য ক্ষমতার মাধ্যমে সংকট মোকাবেলা করাকে সবর বলে। সবর সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন- “হে মুমিনগণ! ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন” - (সূরা বাকারা-১৫৩)। হ্যরত জুনাইদ বাগদাদীকে ধৈর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন- “ধৈর্য হল হাসি মুখে তিক্তির ঢোক গেলা।” হ্যরত হাসান বসরী বলেন- “ধৈর্য দুই প্রকার। প্রথম প্রকার- বিপদ আপদ ও সত্যে সুদৃঢ় থাকা। দ্বিতীয় প্রকার হল-আল্লাহ পাক যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা।” ধৈর্যের অগ্নি পরিক্ষা দিয়েছেন সুফি জগতের মাথার মুকুট নবী দৌহিত্র ইমাম হোসাইন (রা.)। নিজের চোখের সামনে আপন পরিবার-পরিজন, এমনকি কোলের শিশু আলী আজগরের শাহাদাতের করুণ দৃশ্য অবলোকনেও মুহূর্তের জন্য ধৈর্যচূত হননি। পিশাচ সীমারের তরবারী যখন আপন গর্দানে তখনও তিনি ছিলেন ধৈর্যে অবিচল। তাইতো আরেফ কবি মাওলানা আব্দুল হাদী কাঞ্চনপুরী লিখেছেন রক্ত নদী বহি গেলে, প্রিয়ার দামান তলে
সাবধানে কাটাশির রক্ত কভু ছিটাওনা।

প্রেম খেলা সহজ নয়, সাবধানে প্রাণ দিতে হয়
ইমাম হোসাইনের খেলা, দাস হাদী ভুলিওনা।
এ বিষয়ে শাসকের নির্দেশে হ্যরত মনসুর হাল্লাজ (রহ.)’র শূলে আরোহণের মাধ্যমে জীবন দান ও প্রেম রীতি সম্পর্কিত সবরের একটি নমুনা।

ইখলাস:

ইখলাস শব্দের অর্থ একনিষ্ঠতা, একাগ্রচিন্তা, নিবিষ্টতা। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিরেট, নিখাদ অন্তরে ইবাদত তথা যাবতীয় উত্তম কাজে মশগুল থাকাকে ইখলাস বলে। ইখলাস প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন-‘তাদের এ ছাড়া আর কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে’-(সূরা বাইয়িনাহ-৫)। হ্যরত ওয়ায়েস করনী হ্যরত হরম ইবনে হাবৰান (রা.) কে উপদেশ দেন- “তোমার অন্তরে তুমি যা কিছু পোষণ কর সে মতে তোমাকে আখেরাতে জিজ্ঞেস করা হবে। তাই তোমার অন্তরকে স্বচ্ছ রাখ। এক আল্লাহর প্রতি তোমার অন্তর কে নিয়োগ করে তারই সন্তুষ্টি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা রাখ। প্রতিটি কাজে নিয়ত পরিশুল্ক রাখ। এটাই তোমাকে শয়তানের প্ররোচনা হতে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। কারণ অন্তর ও নিয়ত যাদের বিশুদ্ধ, অভিশপ্ত শয়তান প্রথম দিনই তাদের উপর সফলকাম না হওয়ার ঘোষণা করে বলেছে- ‘আদম সন্তানদের মধ্যে মুখলিস বান্দা ছাড়া আমি সকলের সাথেই প্রতারণা করব’ - (সূরা আল হিজর-৩৯-৪০)।” একই নির্দেশনা প্রতিধ্বনিত হয় খলিফায়ে গাউসুল আয়ম মাওলানা আব্দুল হাদী কাঞ্চনপুরীর গানের ছন্দে-

সন্ত রঞ্জ উঙ্গির বিছে - রূহধন কামিনী নাচে।
প্রেমেতে বিভোর জপ লা ইলাহা ইল্লাহ।

খওফ:

খওফ শব্দের অর্থ ভয়, ভীতি। অতি সাধারণভাবে বললে- “ভীত বিহুবল অন্তর নিয়ে মহান আল্লাহ পাকের শানে জালালিয়তের সমীপে নিজের অস্তিত্ব বিলিয়ে দেয়াকে খওফ বলে।” হ্যরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন- ‘আমি রাসূল (দ.)’র নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, ‘সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা সেদিন তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন; যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। তন্মধ্যে ওই ব্যক্তি একজন, যে নির্জনে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে; আর তার চোখ থেকে পানি ঝরে’ - (বুখারি ও মুসলিম)। যদি কোন ব্যক্তি বিনয় এবং খোদাভীতি ছাড়া মারেফাত দাবী করে তবে তার দাবী অগ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। কেননা হ্যরত জুননুন মিসরী বলেন- “আরেফ প্রতিদিন আল্লাহর সমীপে বেশি হতে আরও বেশি ঝুঁকে পড়তে থাকেন। কারণ প্রতিনিয়ত তিনি আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে থাকেন।” তাইতো কবিয়াল রমেশ শীলের সকর্ম মিনতি-
প্রণমি চরণে দীনহীন সন্তানে
বিশ্বপতি তুমি পরম দয়াল।

করুনা নয়নে চাও দীন পানে
ভঙ্গি শূন্য আমি অধম সাওয়াল ।।

ইশ্ক:

ইশ্ক শব্দের অর্থ হচ্ছে কোন কিছুর সাথে হৃদয় জড়িয়ে যাওয়া, প্রেরণার উদ্দেশ্যে হওয়া, মুহৰতের আধিক্য প্রকাশ পাওয়া । ভালবাসার সর্বশেষ স্তরকে ইশ্ক বলে । অর্থাৎ মুহৰতের আধিক্যের ফলে হৃদয়ে সৃষ্টি অবস্থার নামই হচ্ছে ইশ্ক । মহান আল্লাহর সাথে ঈমানদারগণের অধিক ভালবাসার সম্পর্ক প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেন- “ঈমানদার যারা তাঁরা আল্লাহর সঙ্গে প্রচণ্ড ভালোবাসা রাখে” -(সূরা বাকারা-১৬৫) । সুফিয়ায়ে কেরাম সকল প্রকার ইহজাগতিক কামনা-বাসনার উদ্রেক গিয়ে মহান আল্লাহর সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলেন । এমনকি স্বর্গ লাভের প্রত্যাশি কিংবা নরকের ভয়ে ভীত হয়ে তাঁরা কোন ইবাদত করেন না । একমাত্র আপন প্রেমাঙ্গদের সন্তুষ্টি অর্জনই তাঁদের মূল লক্ষ্যবস্তু । বাহরুল উলুম আল্লামা আব্দুল গণী কাথনপুরী বলেন-

দোয়খের ত্রাস নাই, বেহেশতের আশ নাই ।

মাত্র তোমা চাহিবে প্রাণ, গুপ্ত ব্যক্তি মনে প্রাণে ।।

আল্লামা ইকবাল যথার্থই বলেছেন- “হ্যরত ইবরাহিম (আ.)’র সততা ও ইশ্ক, হ্যরত হুসাইন (রা.)’র ধৈর্য ও ইশ্ক। অন্তিমের লড়াইয়ে বদর ও হুনাইনও ইশ্ক ।”

যুহুদ:

যুহুদ অর্থ অনাসঙ্গি, অনাগ্রহ, নির্লিঙ্গিতা, নির্মোহ ইত্যাদি । দুনিয়ার ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করে মহান প্রভুর ইবাদতে মশগুল থাকাকে যুহুদ বলে ।

যাহিদগণ সাধারণ অনাড়ম্বর জীবন পছন্দ করেন । যুহুদের মাধ্যমে মানুষ উৎকৃষ্ট হতে সর্বোৎকৃষ্ট ও উচ্চ হতে উচ্চতম স্থানে অধিষ্ঠিত হয় । রাসূল (দ.) বলেন- ‘দুনিয়ার মোহ পরিত্যাগ করো, আল্লাহ তোমায় ভালোবাসবেন, মানুষের কাছে যা আছে তার লোভ সংবরণ করো, তারা তোমায় ভালোবাসবে ।’

(ইবনে মাজাহ)। হ্যরত দাউদ তায়ী তাঁর মুরিদকে উপদেশ স্বরূপ বলেন- “যদি তুমি তোমার নিরাপত্তা চাও তাহলে তুমি দুনিয়া হতে দূরে থাক । আর যদি বুয়ুর্গী এবং কারামতের আকাঞ্চ্ছা হও তাহলে পরকালের আশা-আকাঞ্চ্ছার গলায় ছুরি চালাও । কাজেই আল্লাহর নির্দেশ পালন ও সন্তুষ্টি কামনা ছাড়া অন্য কোন কিছুর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করোনা ।” হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারির বিবিজান হ্যরতের নিকট ঘর প্রশ্ন ও সুন্দর করার অনুমতি চাইলে তিনি বলেন- “দুনিয়া দ্বারুল রেহালত (পাহুচালা) । এখানে অতসুন্দর ও বেশি প্রশ্ন ঘরের

দরকার কী? দুই দিন বিশ্রাম করার দরকার মাত্র ।”
মাওলানা বজলুল করিম মন্দাকিনী সুরে সুরে বলেন-
দুনিয়া চাইনা মওলাধন, দুনিয়া চাইনা মওলাধন ।
এত দিনে জানিয়ে নিছি, দুনিয়া কেমন ।।
দুনিয়া অনলের কুণ্ড, যে তাতে দিয়াছে মুণ্ড ।
কান্তি সুখ নাশি তারে, করল জ্বালাতন ।।
মাওলানা আব্দুল হাদী কাথনপুরী বলেন-
মিছা ভবের মায়া ছাড় কাল থাকিতে চেষ্টা কর ।
সংকট তুরাইতে হাদী মুর্শিদ কর সঙ্গীজনা ।।

রেংবা:

রেংবা অর্থ আত্মতুষ্টি । সকল পরিস্থিতিতে আল্লাহর ইচ্ছার অনুকূলে খুশিমনে জীবন অতিবাহিত করাকে রেংবা বলে । হ্যরত আবু হায়েম মাদানী জিজ্ঞাসার জবাবে বলেন- “আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষাতাই আমার সম্পদ ।” প্রবল ঝড় বইছে হজুর গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারির ঘর পড়ে যাওয়ার প্রায় উপক্রম । প্রবল ঝড়ের আঘাতে ঘর যাতে পড়ে না যায় সেজন্য হ্যরতের আম্মাজান হ্যরতকে একটি খুটি দিয়ে ঘরে ঠেস দেয়ার জন্য নির্দেশ দেন । স্বভাবত ঠেস দিতে হয় ঝড় যে দিক থেকে বইছে তার বিপরীতে । কিন্তু হ্যরত আকদাস খুটি দিয়ে ঘরে ঠেস দিলেন উল্টো দিকে । অর্থাৎ ঝড় যে দিক থেকে বইছে ঠিক সেই দিকে । ঘরটি পড়ে যাওয়ার জন্য যেন আরও একটি যোগান পেল । এই দৃশ্য দেখে হ্যরতের আম্মাজান হ্যরতকে বলেন-“বাবা! ঘরে ঠেস দিতে হয় ঝড়ের বিপরীতে । “তখন হ্যরত বলেন- মা! ঝড় আল্লাহর নির্দেশেই প্রবাহিত হয় । আমি কি আল্লাহ নির্দেশের বিপরীতে অবস্থান করতে পারি?” এটাই রেংবা । হ্যরত আকদাস কাউকে কাউকে নির্দেশ দিতেন- “ফেরেশতার কালের বনিয়া যাও ।” কখনো বলতেন “এখানে হাওয়া দাফন করা হয়েছে ।” অর্থাৎ প্রত্বন্তির অনুসরণ করা এখানে চির নিষেধ । প্রতিটি কাজে মহান আল্লাহর রেজামন্দিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়াই হচ্ছে রেংবা ।

শোকর:

শোকর অর্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, সন্তুষ্টি প্রকাশ করা । সুখ-দুঃখ, সফলতা-বিফলতা তথা জীবনে চলার পথে ভাল-মন্দ প্রতিটি সময়ে মহান আল্লাহর স্মরণ হতে বিচ্যুত না হয়ে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাকে শোকর বলে । আল্লাহর নেয়ামতের শোকরিয়া আদায় করলে তিনি নিয়ামত বৃদ্ধি করে দিবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন । তিনি বলেন-“যদি তোমরা শোকর আদায় করো আমি তোমাদের নেয়ামতকে আরও বাড়িয়ে দেব । আর যদি অকৃতজ্ঞ হও তবে জেনে রাখ আমার

শান্তি অতি কঠোর” - (সূরা ইব্রাহিম-৭)। তাই সুফিয়ারে কেরামগণ জীবনের প্রতিটি ক্ষণে মহান রবের শোকরিয়া আদায় করেন। গাউসুল আযম হ্যরত আব্দুল কাদের জিলানী (ক.) ব্যবসায় লোকসান কিংবা প্রচুর মুনাফার সংবাদে বলতেন “আলহামদুলিল্লাহ্”। তিনি বলতেন- “মালের জন্য নহে; বরং সুখ বা দুঃখের সংবাদে আমার অন্তকরণ খোদা স্মরণ বিচুত হয় নাই বলিয়াই ‘আলহামদুলিল্লাহ্’।” সুফি শায়ের বলেন- মহিমা তোমার অসীম অপার
আলহামদুলিল্লাহ্ আলহামদুলিল্লাহ্।

আদব:

আদব অর্থ শিষ্টাচার, বিনয়, ন্যূনতা, ভদ্রতা ইত্যাদি। হ্যরত ইবনে হাজার আসকালানীর মতে- “কথায় ও কাজে প্রশংসনীয় ব্যবহারকে আদব বলে।” অপরের সাথে মিষ্টি ভাষায় কথা বলা এবং ন্যূন আচরণ প্রদর্শন করাই হচ্ছে আদব। কথায় আছে মানুষ যত বড় হয়; তত নত হয়। তাই সুফিয়ারে কেরামের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, তাঁরা কথা এবং কাজে বিনয়ী। তাঁদের বিনয়ী ব্যবহারে বিমুক্ত হয়ে কত বিধর্মী ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে সেই সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব। প্রাসঙ্গিক হিসেবে একটি ঘটনাই উল্লেখ করা যাক। একবার জংলী প্রকৃতির এক আরব এসে ইমাম হাসান (রা.) কে গালাগালি শুরু করে দিল। তিনি তাকে জিজেস করলেন- ‘তুমি কি ক্ষুৎপিপাসায় কাতর? না তোমার কোন ধরনের অসুবিধা আছে?’ কিন্তু লোকটা ইমাম হাসান (রা.)’র কথায় কর্ণপাত না করে গালাগালি করতেই লাগল। তখন হ্যরত হাসান (রা.) তাঁর ভূত্যকে বললেন- ‘ঘরে যে টাকার থলে আছে তা এনে এই ব্যক্তিকে দাও।’ তিনি তাকে টাকার থলে দিয়ে বললেন- ‘ভাই এই সময় আমার কাছে এর অধিক কিছু নেই। যদি থাকত তবে অবশ্যই তোমাকে দান করতাম।’ এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে উক্ত ব্যক্তি বিস্মিত হয়ে গেলেন এবং বললেন- ‘আমি সাক্ষ্য দিছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্ রাসূল (দ.)’র সন্তান। অতঃপর সে ইসলাম গ্রহণ করে চলে গেল। বিশ্বালি শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ছোট-বড়, আশরাফ-আতরাফ সকলের সাথে ‘আপনি’ করে কথা বলতেন। এমনকি সমাজের দৃষ্টিতে কথিত সর্বনিম্ন শ্রেণি মেঠরকেও ‘আপনি’ সম্বোধন করে কথা বলতেন। পরন্তু অন্তরে ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং বিনয় ধারণ করে প্রভুর দরবারে নিজেকে নিবেদন করতে পারলেই তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব। মাওলানা বজলুল করীম মন্দাকিনী সুন্দরই বলেছেন- প্রেম খেলার ইচ্ছা যার, সে যাবে যমুনার পার।
প্রাণ ভরা ভক্তি নিয়ে তোরা কে কে যাবি আর।

আদল:

আদল অর্থ ন্যায় বিচার করা, ভারসাম্য রক্ষা করা, ইনসাফ করা। পরিভাষা অনুযায়ী হচ্ছে আদল- “কোন বন্ধু তার অধিকারীদের মধ্যে এমনভাবে ভাগ করে দেয়া, যাতে কারো অংশ বিন্দু পরিমাণ কম বা বেশি না হয়।” অর্থাৎ যার যেটুকু প্রাপ্য, তাকে তা আদায়ের জন্য সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই হল আদল। আদল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেন- “হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ্ উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোন সম্প্রদায়ের শক্রতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করবে না। সুবিচার কর। এটাই খোদাভীতির অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত - (সূরা মায়েদা-৮)। সুফিয়ারে কেরামগণ ইনসাফ তথা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় সর্বাধিক সচেষ্ট থাকেন। হ্যরত ওমর (রা.)’র পুত্রের বিরংদে যখন মদ্যপানের অভিযোগ আসে তখন তিনি পুত্রের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ না করে ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় দৃষ্টান্তস্থাপন করেছেন। হজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী আদল তথা ন্যায় বিচার আদায়ের জন্য আদালতে যাওয়ার পরামর্শও প্রদান করেছেন। মৌলবী মনিরুল্লাহ নামক এক ভজ্জের জমি ধনী প্রতিবেশির অন্যায় দখল হতে মুক্ত করতে হ্যরত আকদাস নির্দেশ দেন- “তুমি আদালতে আর্জি কর। তোমার জমি পাইয়া যাইবে।”

সুফি সাধকরা তাঁদের সায়েত (ভ্রমণ) তাওহীদের ভিত্তিকে সুদৃঢ় এবং অবিচ্যুত করার মানসে অনেক সময় অচেনা-অজানা পথ প্রান্তরে ঘুরে ফিরে নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে থাকেন। এটি নবী-রাসূলদের জীবনেও সংঘটিত হয়েছে। হ্যরত মুসা (আ.) এর সঙ্গে হ্যরত খিয়ির (আ.) এর পরিচয় এবং সম্পর্ক ভ্রমণের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। আল্লাহপাক জমিনে অসংখ্য আউলিয়া কেরাম দেশে দেশে সফর করে সঞ্চিত অভিজ্ঞার আলোকে তাওহীদ প্রচারের লক্ষ্যে পর্যবেক্ষণমূলক ধারণা এবং যুগোপযোগী গণমুখী পছ্তার উদ্ভাবন ঘটিয়েছেন।

সুফিয়ারে কেরামের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়; তাঁদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপই উপরোক্ত মূলনীতি সমূহের আলোকে পরিচালিত হয়। আমরা যারা তাসাউফ-তৃরিকতের আলোকে জীবন পরিচালনা করার চেষ্টা করি তাদেরও উচিত উপরোক্ত নীতি সমূহ নিজেদের জীবনে প্রতিফলিত করার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকা। মহান আল্লাহ্ পাক তাঁর মাহবুবীন বান্দাগণের সম্বকায় আমাদেরকে তাসাউফ-তৃরিকতের নীতিমালার উপর জীবন পরিচালনা করার তাওফিক দান করুন। আমিন। বিহুরমাতি সায়িদিল মুরসালিন (দ.)।



দরবারে গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী'র 'গাউসিয়া হক মনজিল' এর সম্মানিত সাজ্জাদানশীন আওলাদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম রাহবারে আলম হ্যরত শাহ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মঃ) লিখিত বার্তার মাধ্যমে মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রিয় পর্ষদ নিয়ন্ত্রণাধীন দেশ-বিদেশের শাখাসমূহকে গাউসুল আয়ম বিল বিরাসত কুতুবুল আকতাব হ্যরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর মহান ২২ চৈত্র (২০২১) উরস শরিফ উপলক্ষে যে সকল হাদিয়া সংগ্রহ করেছেন, সে সকল হাদিয়া নিজ নিজ এলাকার করোনায় পর্যন্ত পরিবারসমূহকে সহায়তা হিসেবে বিতরণের সদয় নির্দেশনা বাস্তবায়নের কয়েকটি চিত্র



গত ৭ জুন ২০২১ খ্রি. 'শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কং) ট্রাস্ট' পরিচালিত 'দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প'র ব্যবস্থাপনায় ও মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ, মানিকছড়ি শাখার তত্ত্বাবধানে "মাইজভাণ্ডারী দাতব্য চিকিৎসালয়"-এর কার্যক্রম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ১নং মানিকছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শফিকুর রহমান ফারুক, মানিকছড়ি উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তামানা মাহমুদ ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং করোনাকালীন বিভিন্ন দাতব্য চিকিৎসালয়ে সুবিধাবপ্রিতদের চিকিৎসাসেবা নেওয়ার কয়েকটি দৃশ্য



শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কং) ট্রাস্ট-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত বহুমাত্রিক কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠানসমূহ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

০১. মাদ্রাসা-ই-গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী,
মাইজভাণ্ডার শরিফ, চট্টগ্রাম।
০২. উম্মুল আশেকীন মুনওয়ারা বেগম এতিমখানা ও
হিফ্যখানা, মাইজভাণ্ডার শরিফ, চট্টগ্রাম।
০৩. গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী ইসলামিক ইন্সিটিউট (দাখিল),
পশ্চিম গোমদঙ্গী ১৩নং ওয়ার্ড, বোয়ালখালী, পৌরসভা, চট্টগ্রাম।
০৪. গাউসিয়া কলন্দরীয়া নঙ্গীয়া মাদ্রাসা হেফজখানা ও
এতিমখানা,
বেতছড়ি ১৩নং ওয়ার্ড, ১৩নং ইসলামপুর, ঠাণ্ডাছড়ি, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।
০৫. শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসা
গোরখানা, মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
০৬. শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কং) স্কুল,
শান্তিরন্ধীপ, গহিরা, রাউজান, চট্টগ্রাম।
০৭. মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক
মাইজভাণ্ডারী হিফ্যখানা ও এতিমখানা,
হামজারবাগ, বিবিরহাট, চট্টগ্রাম।
০৮. শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী
(কং) ইসলামি একাডেমি, হাইদগাঁও, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
০৯. শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী ইবতেদায়ী ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসা,
সুয়াবিল, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
১০. বিশ্বালি শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক
মাইজভাণ্ডারী (কং) হাফেজিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা,
হাটপুরুরিয়া, বটতলী বাজার, বরংড়া, কুমিল্লা।
১১. মাদ্রাসা শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক
মাইজভাণ্ডারী (কং) ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, মনোহরদী, নরসিংহদী।
১২. জিয়াউল কুরআন নূরানী একাডেমি, পূর্ব লালানগর, ছেট
দারোগার হাট, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।
১৩. মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক
মাইজভাণ্ডারী, সৈয়দ কোম্পানী সড়ক, ফরহাদাবাদ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
১৪. মাদ্রাসা-ই জিয়া মওলা হক ভাণ্ডারী,
পশ্চিম ধলই (রেল-লাইন সংলগ্ন), হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
১৫. শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা,
পাটিয়ালছড়ি, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
১৬. মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী, বৈদ্যেরহাট, ভুজপুর, চট্টগ্রাম।
১৭. শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা,
ফতেপুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
১৮. মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক
মাইজভাণ্ডারী, খিতাপচর, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
১৯. জিয়াউল কুরআন জামে মসজিদ ও ফোরকানিয়া
মাদ্রাসা, চরখিজিরপুর (ট্যাক্সির), বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
২০. শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা,
মেহেরআটি, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
২১. জিয়াউল কুরআন সুন্নিয়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা,
এয়াকুবদঙ্গী, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

২২. শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা,
চন্দনাইশ (সদর), চট্টগ্রাম।

২৩. হক ভাণ্ডারী নূরানী মাদ্রাসা, নূর আলী মিয়ার হাট,
ফরহাদাবাদ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

২৪. শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী দায়রা শরিফ ফোরকানিয়া
মাদ্রাসা, চরখিজিরপুর, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

২৫. শাহানশাহ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কং)
ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, পশ্চিম ধলই (রেললাইন সংলগ্ন),
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

২৬. বাইত-উল-আসফিয়া, মাইজভাণ্ডারী খানকাহ শরিফ,
খাদেম বাড়ি (৩য় তলা), বাড়ি # ৪, ব্লক # ক, মিরপুর হাউজিং
এস্টেট, উত্তর বিশিল, থানা-শাহ আলী, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।

শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প:

- শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কং) বৃত্তি তহবিল
“সুবিধাবন্ধিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প”:
- হোসাইনী দাতব্য চিকিৎসালয় ও খত্না সেন্টার
মাইজভাণ্ডার শরিফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম
- সৈয়দ নূরুল বখতেয়ার শাহ (রং) দাতব্য চিকিৎসালয়
গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী খানকাহ শরিফ, বিবিরহাট, চট্টগ্রাম
- জামাল আহমদ সিকদার দাতব্য চিকিৎসালয়
স্টীলমিল বাজার, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম
- হ্যরত আকবর শাহ (রং) দাতব্য চিকিৎসালয়
ইস্পাহানী ‘সি’ গেইট, আকবর শাহ, চট্টগ্রাম
- সৈয়দ ছালেকুর রহমান শাহ (রং) দাতব্য চিকিৎসালয়
ধামাইরহাট, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম
- শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী (কং) দাতব্য চিকিৎসালয়
আজিমপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম
- সৈয়দ আবদুল গণি কাঞ্চনপুরী (রং) দাতব্য চিকিৎসালয়
মানিকপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম

দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থিক সহায়তা প্রকল্প:

- যাকাত তহবিল
- দুষ্ট সাহায্য তহবিল

মাইজভাণ্ডারী আদর্শগত গবেষণা ও প্রকাশনা প্রকল্প:

- মাইজভাণ্ডারী একাডেমি
- আলোকধারা বুকস
- মাসিক আলোকধারা

আত্মান্বানন্দমূলক যুব সংগঠন:

- তাজকিয়া
- দি মেসেজ

সংগীত ও সংস্কৃতি চর্চা প্রকল্প:

- মাইজভাণ্ডারী মরমী গোষ্ঠী
- মাইজভাণ্ডারী সংগীত নিকেতন

জনসেবা প্রকল্প:

- দৃষ্টিনন্দন যাত্রীছাউনী, মুরাদপুর মোড়, চট্টগ্রাম।
- দৃষ্টিনন্দন যাত্রীছাউনী ও ইবাদতখানা, নাজিরহাট তেমোহনী রাস্তার মাথা।
- দৃষ্টিনন্দন যাত্রীছাউনী, শান-ই-আহমদিয়া গেইট সংলগ্ন, মাইজভাণ্ডার শরিফ।

বার্ষিক অনুষ্ঠানসমূহে

- ন্যায্যমূল্যের হোটেল (মাইজভাণ্ডার শরিফ),
ভার্ম্যমাণ ওয়ুখানা ও টয়লেট।